ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬২ বর্ষ ৭ সংখ্যা ।। ২৫ আশ্বিন, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১২ অক্টোবর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

রাজ্যগুলির রিপোর্ট

ভারতের জনসংখ্যার দুই শতাংশই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতের মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে শতকরা দু-ভাগই বাংলাদেশী। দীর্ঘদিন ধরে এটা জানা থাকলেও এই প্রথম রাজ্য সরকারগুলির পাঠানো রিপোর্টে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অনেক ছাড়-ছুট দেওয়ার পরও রাজ্য সরকারগুলির পাঠানো রিপোর্ট অনুসারে সঠিক তথ্য-প্রমাণ ও অনুমতিপত্র ছাড়াই ভারতে ঢুকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের সংখ্যা ২ কোটিরও বেশি। রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে তাদের রাজ্যে কতজন বাংলাদেশী রয়েছে এবং কতজনকেই বা আবার তাদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে— এই মর্মে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। বেশিরভাগ রাজ্যই এই রিপোর্ট পাঠিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, গত এক বছরে মাত্র ৬০০ জন বাংলাদেশীকে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এখন সারা দেশের প্রায় সব রাজ্যেই কমবেশি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার, অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে তারা বসতি স্থাপন করেছে। ইদানীং মহারাষ্ট্র, দিল্লী, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও কর্নাটকেও এখন বাংলাদেশীরা ঢুকে পড়ছে। যেসব এলাকার শহরীকরণ বা উন্নয়ণ হচ্ছে, বাংলাদেশীরা সেখানেই কাজের খোঁজে ছুটে যাচ্ছে।

একজন পদস্থ সরকারি অফিসারের মতে অবশ্য এইসব তথ্য সেল্‌ফেই তোলা থাকবে, বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হবে না। কেননা, অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে সরকারের নীতি স্পষ্ট নয়। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি একমত হয়ে এই বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই কিছু করা সম্ভব। শুধু নিরাপত্তার প্রশ্নেই নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা দেশের সামনে এক বড় বিপদ বলে তিনি জানান।

বিজয়ার শুভেচ্ছা

শুভ বিজয়া দশমী উপলক্ষে স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক, এজেন্ট, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

– স্বস্তিকা পরিবার

গ্রাম, প্রকৃতি ও গো-রক্ষার অঙ্গীকার

কুরুক্ষেত্রে সূচনা বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস প্রসিদ্ধ থিম পার্ক সাক্ষী থাকল আরেকটি অনন্য ঐতিহাসিক অধ্যায়ের। গত ৩০ সেপ্টেম্বর লক্ষাধিক মানুষের জনসমাগমে সেখানে ঘোষিত হল প্রকৃতি ও গ্রাম রক্ষার অঙ্গীকার। বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সূচনা উপলক্ষে ওইদিন থিম পার্কে প্রথম সারির সাধু-সন্ত, বিজ্ঞানী, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বোধহয় নতুন করে এই কথাটাই বোঝাল যে গো-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই মুহূর্তে সমাজের সর্বস্তরেই অনুভূত হচ্ছে।

শঙ্করাচার্য রাঘবেশ্বর ভারতী ও চিত্রাভিনেতা সুরেশ ওবেরয়ের গো-বন্দনা দিয়ে শুভ সূচনা হয় বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার। যাত্রার প্রারম্ভে বিশ্ববিখ্যাত শঙ্খবাদক শ্রীশাভাছু-র শঙ্খবাদ্য নিঃসন্দেহে অন্য মাত্রা যোগ করে সূচনাপর্বে। একই সঙ্গে উল্লেখ্য, ওস্তাদ সঈদুদ্দিন দাগরের গোরু নিয়ে তৈরি একটি স্বরচিত সঙ্গীত। ওইদিন মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দ সরস্বতী, পেঝাওয়ার স্বামী শ্রী বিশ্বেশাতীর্থ, আর এস এসের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অশোক সিংঘল, প্রাক্তন সি বি আই প্রধান সর্দার যোগীন্দর সিং, ছোটে মিঁয়া মইনুদ্দিন শবরী প্রমুখ। ১৬০ ফুট লম্বা মঞ্চটি দর্শনীয় তো বটেই, আকর্ষণীয়ও হয়েছিল। মঞ্চের মাঝখানে একটি বিশালাকৃতি গোরুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তার ডানপাশে সাধু-সন্ত ও বাম পাশে অন্যান্যদের বসার জায়গা ছিল।

মঞ্চে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) ভাইয়াজী যোশী, অশোক সিংঘল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী তাঁর বক্তব্যে দেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণে অপদার্থতার কথা তুলে তাঁদের কটাক্ষ করেন। শ্রীযোশী বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক নেতারা শুধুমাত্র নগরায়নের দিকেই নজর দিয়েছেন, গ্রামকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। তিনি আরও বলেন, রাসায়নিক সারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং কৃষিকাজে অতিরিক্ত যন্ত্রের ব্যবহার ধ্বংস করছে সমৃদ্ধ

(এরপর ৪ পাতায়)

সিপিএমের দেখানো পথেই জোট চাইছেন মমতা

গূঢ়পুরুষ।। সি পি এমের সমর্থনে শিলিগুড়ি পুরসভার বোর্ড গঠন করায় কংগ্রেসকে 'গদ্দার' আখ্যা দিয়ে মমতা ব্যানার্জী যেভাবে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাতে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে বাম বিরোধী জোটের স্থায়িত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সন্দেহ প্রকাশ করাটা স্বাভাবিক। কারণ, যে কোনও জোটের স্থায়িত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে 'কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম' বা ন্যূনতম যৌথ কর্মসূচীর ওপর। এই রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে হয়নি। ওই নির্বাচনে বামফ্রন্ট

প্রার্থীদের পরাজিত করার লক্ষ্যেই জোট গড়ে বিরোধী প্রার্থী দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল, বিরোধী ভোট বিভাজন রুখে দিয়ে বাম প্রার্থীদের পরাজিত করা। সকলেরই মনে আছে যে, মমতা তখন বলেছিলেন দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূল শক্তিশালী। তাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে তাঁর দলই লড়বে। এই ফর্মুলাতেই ঠিক হয় উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস এবং দক্ষিণে শেষ কথা বলবে তৃণমূল। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকসভা আসনে তৃণমূলের অপ্রত্যাশিত সাফল্য দলের নেত্রীর মত বদল করে। মমতার ধারণা হয় যে, তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মার জন্যই নির্বাচনে এই বিপুল সাফল্য এসেছে। বামবিরোধী ভোট বিভাজন রুখে ওই সাফল্য আসেনি। তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস জিতেছে। কলকাতার একটি বাংলা দৈনিক ও দুটি বাংলা টিভি চ্যানেল ক্রমাগত চাটুকারিতা চালিয়ে মমতার ক্ষোভের আগুনে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে। এরই পরিণামে নেত্রী লোকসভা নির্বাচনের পর জোটের শরিক রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কলকাতা পুরসভা, বিধানসভার উপনির্বাচন, বেশ কিছু জেলার পৌরসভা নির্বাচন এমনকী ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে একটিও বৈঠক আজ পর্যন্ত করেননি।

এর কারণ, মমতা প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিশ্বাস করেন না। তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেস গড়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের দাদাদের সি পি এমের 'দালালি' করার প্রতিবাদে। মমতা তখন তাঁর এইসব কংগ্রেসী দাদাদের 'তরমুজ' এবং রাজ্য কংগ্রেসকে সি পি এমের 'বি' টিম বলতেন। হ্যাঁ, প্রকাশ্যেই বলতেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে জোট গড়া নিয়ে বিস্তর জলঘোলাও হয় এই বিষয়টি নিয়ে।

(এরপর ৪ পাতায়)

দেশের নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করছে সরকার ঃ ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তের নিরাপত্তার মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও চীন কী করছে তা সকলে জানে। এইসব দেশগুলি যেসব কাজ করছে তাতে আমাদের আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই দেশগুলির কাজকর্মের কথা মাথায় রেখেই আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। গত ২ অক্টোবর দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক সমাবেশে একথা বলেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের মানুষকে বন্ধু করাই ভারতের প্রকৃতি। কেউ আমাদের শত্রু নয়। কিন্তু ঘটনা হল, পৃথিবীতে অনেক

দুর্জন রয়েছে। কয়েকটি শক্তিশালী দেশ বড় বড় কথা বলে নিজেদের ইচ্ছা অন্য দেশের ওপর চালিয়ে দিতে চাইছে। শক্তিশালী দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে ভারতে সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়। এই বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে হবে। মূল্যবোধ ও সত্য রক্ষার জন্য তাই আমাদের নিজেদের শক্তিশালী হতে হবে।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

মুসলিম দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন পণ্ড রামপুরহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিজয়া দশমীর দিন পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দেবী দুর্গার নিরঞ্জন যাত্রায় আক্রমণ চালাল মুসলিম দুষ্কৃতীরা। গোটা ঘটনার জেরে রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করে বীরভূমের রামপুরহাট শহর।

স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ঘটনার সূত্রপাত গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ। ওইদিন ঠাকুর বিসর্জনের উদ্দেশ্যে শহরের বিভিন্ন পুজো মণ্ডল থেকে প্রতিমা বের হতে থাকে। রামপুরহাট রেলওয়ে ইন্সটিটিউট কমিটির শোভাযাত্রার সময় শহরের মুসলিম প্রধান বগটুই-এর বেশ কিছু মুসলিম যুবক জোর করে তাদের শোভাযাত্রায় ঢুকে পড়ে। তারা মহিলাদের সঙ্গে জোর করে নাচানাচি ও অশালীন আচরণ করে বলে অভিযোগ। পুজোর উদ্যোক্তারা তাদের সরাতে গেলে বচসা শুরু হয়। সাময়িকভাবে মুসলিম দুষ্কৃতীরা চলে গেলেও, কিছুক্ষণের মধ্যে ফের সদলবলে তারা জড়ো হতে থাকে। ততক্ষণে পুজো কমিটির ঠাকুর শহরের পাঁচ মাথার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। খবর ছড়িয়ে পড়তে মুসলিম অধ্যুষিত পাড়া থেকেও তারা সদলবলে জড়ো হতে থাকে। আধ ঘন্টার মধ্যে গোটা এলাকা মুসলিম দুষ্কৃতীদের দখলে চলে যায়। লাঠি, ধারালো অস্ত্র, বোমা, পিস্তল নিয়ে তারা গোটা পাঁচ মাথা ঘিরে ফেলে। কারও কিছু বোঝার আগেই কমিটির সদস্যদের ওপর চড়াও হয় তারা। ঘটনাস্থলে জখম হয় পাঁচ যুবক। পুলিশ তখনও নিষ্ক্রিয়। শুধুমাত্র কিছু মহিলা ভলেনটিয়ারই ভরসা। ক্রমে পুরো পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের প্রতিমা নিরঞ্জন যাত্রা থমকে যায়। শুরু হয় মুসলিম দুষ্কৃতীদের অবাধ তাণ্ডব।

অভিযোগ উঠেছে, পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার কারণেই মুসলিমরা এত মারমুখী হয়ে ওঠে। মহম্মদ সাবির, নাসিম সেখ, সিলিং সেখ, সুরাব সেখ, সেন্টু সেখ, সফিউল সেখ, রিয়াজউদ্দিনের মতো কুখ্যাত মুসলিম গুণ্ডারা এদের নেতৃত্ব দেয় বলে অভিযোগ।

জাতীয় সড়ক থেকে প্রতিমা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে এলাকার তৃণমূল বিধায়ক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়। তিনি দুষ্কৃতীদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে তৃণমূলের নির্লজ্জ মুসলিম তোষণই মুসলিমদের আরও এই ঔদ্ধত্যের কারণ।

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, পুলিশ সতর্ক না থাকাতেই মুসলিম দুষ্কৃতীরা আক্রমণ চালাতে সক্ষম হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে হিন্দুদের উৎসবে মুসলিম দুষ্কৃতীরা অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা চালালেও পুলিশ আগাম কোনও সতর্কতা কেন গ্রহণ করেনি সেই প্রশ্নও উঠেছে বারবার। এই ঘটনায় পুলিশ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে রামপুরহাট মহকুমার মল্লারপুরেও ঠাকুর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় হিন্দুদের। পুলিশ মুসলিম দুষ্কৃতীদের পাশে দাঁড়ায়। ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশ-পুজো কমিটির খণ্ডযুদ্ধ হয়। রামপুরহাট মহকুমার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও মুসলিম দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন গুজব রটিয়ে হিন্দু গ্রামগুলিতে অশান্তি সৃষ্টি করে।

বদলের হাওয়ায় সিপিএমপন্থী আমলাদের তৃণমূলে হুড়োহুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ার ফলে আই এ এস-আই পি এস অফিসারদের মধ্যেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যে সব আই এ এস-আই পি এস অফিসার এতদিন সি পি এমের ভজনা করতেন, তাঁরাই এখন সুর বদলে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস নেতা নেত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। শোনা যাচ্ছে, মধ্যরাতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে দেখা করার সময় চেয়ে বহু আই এ এস-আই পি এস অফিসার লাইন দিয়ে পড়ে রয়েছেন। অনেকে মমতার সঙ্গে হটলাইনও করে ফেলেছেন। দু'দিন আগেও যেসব আই এ এস-আই পি এস অফিসারদের জনসভা থেকে মমতা গালি দিতেন তাঁরাই এখন নেত্রীর পদতলে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। জানা যাচ্ছে, এতে নাকি মমতাও খুশি। নেত্রীর মুখে অফিসারদের নিন্দামন্দ আর বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। বরং অনেক সি পি এম-ভজা অফিসারদের তিনি এখন নিজের লোক ভাবতে শুরু করেছেন। তার অন্যতম উদাহরণ এন মঞ্জুনাথ প্রসাদ। এই আই এ এস অফিসারকেই মমতা নিজের সচিব হিসাবে নিয়োগ করেছেন। মঞ্জুনাথ বরাবরই সি পি এমের লোক বলে সরকারি মহলে পরিচিত। এমনকী হলদিয়া উন্নয়ণ পর্ষদে লক্ষ্মণ শেঠের অধীনে সি ই ও হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। যে হলদিয়া পর্ষদ নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করেছিল। লক্ষ্মণ শেঠের একদা প্রিয় পাত্রকে মমতা নিজের সচিব করায় সরকারি মহলে বলাবলি শুরু হয়েছে, আমলারা ক্ষমতায় আসার আগেই মমতার মাথা খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এরকমই আর এক আই এ এস অফিসার সব্যসাচী সেন নাকি মমতার সঙ্গে দেখা করে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিতে চেয়েছেন। এই সেই সব্যসাচী সেন, যিনি রাজ্যের শিল্পসচিব এবং সিঙ্গুরে টাটাদের জন্য চারফসলি জমি কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছিলেন। জমি পেয়েছেন কিন্তু মানুষের বাধায় কারখানা পাননি। এমন আমলাই এখন মমতার পদতলে। যেহেতু দু'জন অফিসার প্রকাশ্যে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে এসেছেন তাই তাঁদেরই নাম লেখা হল। কিন্তু জানা যাচ্ছে, অন্তত ৩০-৪০ জন আই এ এস-আই পি এস অফিসার এখন শিবির বদলে তৃণমূলী হয়ে গিয়েছেন। এমনকী লালগড়ে অপারেশন চালানোর আগে পুলিশের কর্তারা তৃণমূল নেতাদের সব জানিয়েছিলেন। এই অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার এটা অন্যতম কারণ।

এই সময়

মহাকাশ সাফল্যে বঙ্গভাষী

ভারতীয় মহাকাশযান চন্দ্রায়নের চাঁদে জল আবিষ্কারের পর উপর্যুপরি দ্বিতীয় সাফল্য এল আমাদের মহাকাশ গবেষণায়। সঙ্গে উপরি পাওনা— এই সাফল্যের প্রাণপুরুষ এক বঙ্গভাষী। ৩৬ বছর বয়সী মহাকাশ বিজ্ঞানী সেই তরুণের নাম সুদীপ ভট্টাচার্য। তাঁর নেতৃত্বে মুম্বাইয়ের টাটা ইন্সটিটিউট অব্ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চের একদল বিজ্ঞানী নিউট্রন নক্ষত্রের আয়তন মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। প্রসঙ্গত, খুব বড় আকারের কোনও নক্ষত্র কোনও কারণে তার নিজের জ্বালানী দ্বারা অকস্মাৎ পুড়ে গেলে ক্ষতবিক্ষত যে অংশের সৃষ্টি হয় তাকেই নিউট্রন নক্ষত্র বা নিউট্রন স্টার বলে। এরও আয়তন বিশালাকৃতিই হয় এবং এতদিন পর্যন্ত সেই বিশালতার ব্যাপ্তি অজ্ঞাতই ছিল।

পয়সা দিন সেকেণ্ডে

মোবাইলে কথা বলার সময় মিনিটের হিসেব রাখার দিন শেষ হতে চলেছে। এবার সেকেণ্ডের হিসেব রাখার চেষ্টা করুন। অন্তত ট্রাই (টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব্ ইণ্ডিয়া) তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ট্রাই-এর চেয়ারম্যান জে এস শর্মা জেনিভায় ইন্টারন্যাশানাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন কনফারেন্সে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি সাংবাদিকদের বলেন, ''আমরা সমস্ত মোবাইল অপারেটরদের বলেছি, আপনারা অন্যান্য শুল্কের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মিনিটের পরিবর্তে প্রতি সেকেণ্ডে পাল্‌সের হিসেবে আবশ্যিক মাশুল শুল্ক ধার্য করুন।'' সুতরাং ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে— কথা সারুন নিমেষে, পয়সা দিন সেকেণ্ডে।

বুদ্ধের বিরুদ্ধে এফ আই আর

পুলিশী মামলায় জড়িয়ে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বছর দু'য়েক আগে বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, ''রাম হিন্দুদের দেবতা নন। রামায়ণও ধর্মগ্রন্থ নয়। রামসেতু প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে। কোনও মানুষ রামসেতু তৈরি করেননি।'' বুদ্ধের এই মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ওই এলাকায়। বুদ্ধর বক্তব্য হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে— এই অভিযোগে মুজফ্‌ফরপুর সি জে এম আদালতে মামলা দায়ের করেন জনৈক সুধীর কুমার মিশ্র। মামলার শুনানির পরে অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য স্থানীয় পুলিশকে নির্দেশ দেন তদানীন্তন সি জে এম। এরপর মুজফ্‌ফরপুর সদর থানার রিপোর্টের ভিত্তিতে বর্তমান চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রমেশ চন্দ্র মালবিয়া পুলিশকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫ক, ২৯৬ এবং ২৯৮ ধারায় বুদ্ধের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে নির্দেশ দেন। সেইমতো বুদ্ধের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করে পাটনা পুলিশ।

সতেরোটি সেনা-নৌকা

ভারত সীমান্তে বিশেষ করে লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশের কাছাকাছি প্রায় ৪০৫৭ কিমি অঞ্চল জুড়ে চীনা সামরিক সজ্জার মোকাবিলায় পূর্ব লাদাখে আধুনিক অস্ত্রসজ্জা এবং অরুণাচলের পুরনো বিমান ঘাঁটিগুলিকে সচল করার পাশাপাশি লাদাখে ১৭টি উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন সেনা-নৌকা নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাঁগো-র লাদাখি হ্রদে ১৭টি 'ফাস্ট ট্র্যাক' সেনা নৌকা নামবে যেগুলি আগামীদিনে 'কুইক রিয়্যাকশন টীম' হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে বলে সরকারের বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে। আসলে পূর্ব লাদাখে অবস্থিত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৯০০ ফুট উঁচু এবং ১৩৪ কিমি দীর্ঘ পাঁগো হ্রদ ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বলয়ের দিক থেকে বরাবরই খুব স্পর্শকাতর জায়গা হিসেবে চিহ্নিত।

তিনে এক যাযাবর

জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গৃহীত জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ণ কর্মসূচীতে (ইউনাইটেড নেশন্‌স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) অতি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষে প্রতি তিনজন মানুষ পিছু একজন হলেন যাযাবর (মাইগ্রান্ট)। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম শীর্ষক প্রতিবেদনে যার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দেশভাগের কারণজনিত উদ্বাস্তু সমস্যাকেই দায়ী করা হয়েছে। ওই রিপোর্টে দেশভাগের সময়কার উদ্বাস্তু স্রোতকে পৃথিবীর বৃহত্তম যাযাবরবৃত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেইসময় প্রায় দেড় কোটি মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই উদ্বাস্তু স্রোত এখনও চলছে এবং নিজ বাসস্থানহীন ও কর্ম উপলক্ষে একস্থান থেকে অপর স্থানে মানুষের যাতায়াতের হিসেব ধরে প্রতিবেদনটি উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

বিচারকের সম্পত্তি ফাঁস

ঘর-বাড়ি আর বিনিয়োগের টাকার পরিমাণ ফাঁস। কার? তাও আবার বিচারকদের। এ নিয়ে একুশে আইন একটা ছিলই। কিন্তু তার প্রয়োগ এই একবিংশ শতাব্দীতে! ভাবা যায়! এই অসাধ্য সাধনটিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য করে দেখাল এদেশের সর্বোচ্চ আদালত। গত ৫ অক্টোবর তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) আইনের এক ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে গৃহীত একটি প্রস্তাব মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত বিচারপতিদের যাবতীয় সম্পত্তির হাল-হকিকৎ সম্বলিত বয়ান পাঠানো হয় সুভাষ চন্দ্র আগলওয়ালের কাছে। প্রসঙ্গত, শ্রী আগরওয়াল দিল্লী হাইকোর্টের একক বেঞ্চের এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন সুপ্রীম কোর্টে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মাওবাদী মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ইউনিফায়েড কম্যাণ্ড

মাওবাদীদের নৃশংস হত্যালীলা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে লালগড় প্রায় প্রতিদিনই লাল রঙে রঞ্জিত হইতেছে। অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর জন্মদিন ২ অক্টোবরেই মাওবাদীদের হিংসার বলি হইয়াছেন বিহারের খাগাড়িয়া জেলার বিয়ারা গ্রামের ১৭ জন নিরপরাধ নিরীহ গ্রামবাসী। গত ৬ অক্টোবর ঝাড়খণ্ড পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অপহৃত ইন্সপেক্টর ফ্রান্সিস ইন্দওয়ার নিহত হইয়াছেন। ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের হাতে গত দু'বছরে ৩৩৮ জন পুলিশের প্রাণ গিয়াছে।

আজ দেশের ১৬টি রাজ্য এবং ১৬৬টি জেলায় মাওবাদী কার্যকলাপ বিস্তৃত। নেপাল থেকে তামিলনাড়ুর ধরমপুর জঙ্গল পর্যন্ত মাওবাদীদের লম্বা গলি বা করিডর সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ মাওবাদীদের মুক্ত(াঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। সেখানে মাওবাদীরাই শেষ কথা বলে। মাওবাদীদের ক্যাডার প্রায় ২.৫ ল(হইতে ৩ ল(সংখ্যায় রহিয়াছে। জোর করিয়া বা ভয় দেখাইয়া বছরে প্রায় তাহারা ২০০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা আদায় করিয়া থাকে। অনেকে ভয়ে এবং বাধ্য হইয়া নিয়মিত অর্থ যোগান দিয়া প্রাণ র(া করে। পূর্বে মাওবাদীরা বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক সংগ্রহ করিত, আজকে দেশের গুপ্ত ঘাঁটিগুলিতে আধুনিক অস্ত্র তৈরি করা হয়, ল্যাণ্ডমাইন জোড়া দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ ও দ(প্রশি(কদের হাতে ক্যাডাররা প্রশি(ণ পাইয়া পাকা গেরিলা হইয়া উঠে। আগে মাওবাদীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত(হইয়া আত্র(মণ করিত এবং আত্র(মণের পরেই পালাইয়া যাইত এবং গোপন ডেরায় আত্মগোপন করিয়া থাকিত। অর্থাৎ 'হিট অ্যাণ্ড রান'-এর কৌশলে তাহারা অপারেশন চালাইত। সম্প্রতি তাহারা বহু সংখ্যায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া টার্গেটের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, আত্র(মণ চালাইয়া থাকে। অর্থাৎ হিট ও রানের পরিবর্তে তাহারা 'কনফ্রন্টেশন' কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। এইভাবেই মাওবাদীরা তাহাদের আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে। তাহাদের এই শক্তি(বৃদ্ধি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার প(এক গু(তর চ্যালেঞ্জ।

খোদ প্রধানমন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার (ে ত্রে মাওবাদীরা সর্বাপে(া বড় চ্যালেঞ্জ। প্রশাসনের সমন্বয় ও মর্যাদার প(মাওবাদীরা আজ একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন(হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই সন্ত্রাসবাদীদের মতো মাওবাদীদের বিদ্রোহ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। মাওবাদীদের মোকাবিলায় তাই আজ প্রয়োজন কেন্দ্র সরকারের অধীনে 'ইউনিফায়েড কম্যাণ্ড'। বর্তমানে যে 'ইউনিফায়েড কম্যাণ্ড' রহিয়াছে তাহা তত কার্যকরী নয়। মাওবাদীদের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে একটি বহুমুখী এজেন্সী তথ্য সরবরাহ করিয়া থাকে এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর সং(-ষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া সমন্বয় সাধন করে। অন্যদিকে মাওবাদীরা সাধারণত দুইটি রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাতেই আঘাত হানিতে বেশি পছন্দ করে। কেননা, সং(-ষ্ট দুই রাজ্য সরকারই নিজেদের দায় এড়াইয়া যাইতে চায়। আর এজন্যই চাই 'কেন্দ্রীয় ইউনিফায়েড কম্যাণ্ড'।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যে স্বাধীন ভারতে অজেয় বীর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অপ্রতিহতগতি বিরাট বাহিনী কেবল দেশর(া করিত না, দিগ্বিজয়ে বাহির হইত, যে ভারতের সীমা প্রাগ-জ্যোতিষপুর হইতে কাম্পিয়ান হ্রদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সম্রাট অশোকের বলশালী বাহু যাহাকে সংগঠিত করিয়া জগতের সকল দেশের ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর 'স্বাধীন' ভারত তাহা হইতে কতদূরে সরিয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতেতিহাসের পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। তাঁহারা বেদনাভরা চিত্তে ইহাই অনুভব করিবেন যে, এ ভারত চন্দ্রগুপ্ত অশোকের ভারত নহে, হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের নহে, মারাঠা কেশরী বালাজীরাও-এর ভারত নহে, এই ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতাদের নিজের দেশের ধর্ম তো দূরের কথা সভ্যতা, সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও আদর্শে বিশ্বাস নাই। আত্মবিশ্বাসহীন-আত্মনির্ভরতাশূন্য, মে(দন্ডহীন, বৈদেশিক নীতির অনুসরণকারী ভারত এশিয়ার নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্ন চিরকালই স্বপ্ন থাকিবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের শক্তি(নির্ভর করে উহার মানুষগুলির উপর। রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সুসংগঠিত জাতিতে পরিণত করিলে উহাই হয় রাষ্ট্রের শক্তি(ও সমৃদ্ধির ভিত্তি। ভারতে সেভাবে জাতি গঠনের চেষ্টা বৃটিশ রাজত্বে না হইবার কথা। কিন্তু ভারতের চরম দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও সেকাজ আরম্ভ হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তো সে কাজ করিবেনই না, 'সেকুলার' সাজিবার অতিরিক্ত(আগ্রহে জনসাধারণকেও তাহা করিতে দিবেন না।

স্বাধীন ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় নেতারা মনে করেন যে, এদেশে বাস করিলেই সকল নরনারী একটি জাতিতে সংগঠিত হইয়া গেল। তাহা যদি হইত তবে মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্ব এদেশে প্রচারিত হইতে পারিত না, এবং দেশ বিভাগের কোনও প্রশ্ন উঠিত না।

এখানে চাই পরস্পরের হৃদয়ে স্নেহের স্পর্শ, প্রাণের টান, সংস্কৃতি, আদর্শ ও রাজনৈতিক মতবাদের একত্বের বলে সৃষ্ট আত্মীয়তাবোধ। ভারতবাসীর মনে যতদিন এইরূপ আত্মীয়তাবোধ না জন্মিবে ততদিন সঙ্ঘবদ্ধ জাতিগঠন অসম্ভব।

— ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সঙ্কটে, গভীর সঙ্কটে পশ্চিমবঙ্গ

অমলেশ মিশ্র

একজন নেতা, একজন নেত্রী। একজন পার্টি মেড, অপরজন ম্যানমেড। একজন ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচেন, অপরজন ধরতে পারলে বাঁচেন। একজন পড়তি, একজন উঠতি।

রাজ্যের রাজনীতিতে এই স্রোত। এই স্রোত মানুষকে বিচলিত করছে। রাজনীতিতে জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন একান্ত স্বাভাবিক। ব্যক্তি(জীবনে যেমন দুঃখ ও আনন্দ চক্র(াকারে ঘোরে, রাজনীতিতেও তাই হয়। কারণ এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বলা যায় প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত বা ঈ(ের অভিপ্সিত কালপ্রবাহ।

চলতি স্রোত রাজ্যের মানুষকে শুধুমাত্র বিচলিত করেছে বললে কম বলা হয়। চিন্তাশীল বাঙালীর অনেকেই ভবিষ্যৎ ভেবে ভীত হয়ে পড়েছেন যে, রাজনীতির অর্থ এই রাজ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিহিংসা, খুনোখুনি ও এলাকা দখলের যুদ্ধ। পাঁচ মিনিট ভাবলেই সকলের নজরে তা আসবে। আপাতত এই রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নেই, অর্থনৈতিক কোনও পরিকল্পনা নেই। প্রতিদিনের সংবাদমাধ্যম সে সংবাদগুলি দিচ্ছে তাতে গঠনমূলক বা আশাসঞ্চারী কিছু থাকছে না। আর বাস্তবে আশাসঞ্চারী যদি কিছু না-ই থাকে, সংবাদমাধ্যম তা পাবেই বা কোথায়? দু'দশটা নতুন ট্রেন চালু হওয়াকে কোনও আশাসঞ্চারী বিষয় বলে মনে করছি না। আশাসঞ্চারী হোত যদি দু'দশটা নতুন রেল লাইন স্থাপিত হতো। রেশনে আলু, তেল ও চিনি পাওয়াকে আশাসঞ্চারী ধরছি না। আশাসঞ্চারী হতো যদি কোনও নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শু(হতো।

লোকসভা নির্বাচনে সি পি এম নির্মমভাবে পরাজিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দল তার সুযোগ নিচ্ছে বা নেবে। কিন্তু পরাজয়ের কারণ বি(ে-ষণে পরাজিতরা ঐক্যমত হতে পারলেন না। লোকসভা নির্বাচনের এক বছর আগে কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে সি পি এম যে ভুল করেছে, দলের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি যে মানুষকে (ি(প্ত করেছে, বাম জোটের নেতারা যে পরস্পরকে আত্র(মণ করছেন, কোনও (ে ত্রে কাজের কোনও দ্রুততা না থাকা, কিছুই পরাজয়ের কারণ হল না। পরাজয়ের কারণ হল, মুখ্যমন্ত্রীর শিল্পনীতি। বস্তুত, সি পি এমের কেন্দ্রীয় নেতাদের এই মূল্যায়ণ এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দল ও সরকারের নেতৃত্ব সম্পর্কে চরম উদাসীন করেছে। যে কারণে তিনি পলিটব্যুরোর মিটিংয়ে যান না, যে কারণে মংপং-এ বেড়াতে গিয়ে তিনি হঠাৎ করে ফিরতে চান না, যে কারণে তিনি আর মুখ্যমন্ত্রী থাকতেই চান না। তার গাঁটের ছুরি তাঁরই গাঁট কাটছে। এর থেকে একজন মানুষের যদি সে ব্যক্তি(গতভাবে আদর্শনিষ্ঠ হয়, দুর্বিসহ ও অসহনীয় অবস্থা আর কিছু হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এখন সরকার ও দল কোথাও নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী নন। তাঁর বিকল্প একজন কেউ এসে সহানুভূতি দেখিয়ে বলছেন না যে ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম নিন, আমি দেখছি।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন এক ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও আইন-শৃঙ্খলা কাজ করছে না। আইনী এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থাগুলিও প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন হচ্ছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সর্বাংশে বিঘ্নিত। পেশীশক্তি(ই রাজনীতির আশ্রয় হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস নামের সংবাদপত্র প্রথম পাতায় খবর করেছে যে, রেল মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ১২টি ক্যাবিনেট মিটিংয়ের ৭টিতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত হওয়া ৫টি মিটিংয়ের একটিতে তিনি ওয়াক আউট করেছিলেন। সংবাদে আরও বলছে যে রাজ্যে রাজনীতি নিয়ে তিনি এতই ব্যস্ত যে মাসের ২০ দিনই তিনি থাকছেন রাজ্যে। তিনি এমন একটি ক্যাবিনেট মিটিংয়ে অনুপস্থিত ছিলেন যে মিটিংয়ের একটি অ্যাজেণ্ডা ছিল ভারতের রেলের উন্নয়ণে জাপান থেকে ১৭,৭০০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার প্রসঙ্গ। তাঁর অনুপস্থিতি বুঝিয়ে দিল যে আপাতত ভারতীয় রেলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে রেলমন্ত্রক নিজেই উৎসাহিত নয়। দিল্লীতে তার অনুপস্থিতির কারণে অনেক জ(রি বিষয়ে পরামর্শ ও স্বা(র হচ্ছে না। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এমকে পরাজিত করা তাঁর মূল রাজনৈতিক অ্যাজেণ্ডা হওয়ায় রেলমন্ত্রকে তিনি সময় কম দিচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও খবর যে, অ(ণাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব যাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে তৃণমূল যোগাযোগ করছে। শুধু অ(ণাচল প্রদেশ নয়, বিহারও তৃণমূলের নজরে আছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী যোগাযোগ রাখছেন। বিহার বিধানসভার কথা ভেবে। রেলমন্ত্রী হিসাবে মমতা ব্যানার্জীকে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন নীতিশ কুমার। অথচ মমতা ব্যানার্জী রেল মন্ত্রীত্বের ১০০ দিনের মধ্যে বিহারেই রেলযাত্রীদের নারকীয় নিরাপত্তাহীনতায় পড়তে হয়েছে। কয়েকটি মারাত্মক ঘটনা বিহার রাজ্য এলাকার মধ্যেই ঘটেছে।

মমতা ব্যানার্জীর প্রথম এবং প্রধান আগ্রহ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি— সং(পে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং তাকে সামনে রেখে বর্তমানে এলাকা দখল। দ্বিতীয় আগ্রহ রেলমন্ত্রক এবং তৃতীয় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সি পি এমের বিকল্প হওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে অন্যান্য রাজ্যে দল গড়ে তোলা।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বরাবরই রাজ্য রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। কিছু স্বপ্ন দেখেছেন— কিন্তু তার বাস্তবায়নে সঙ্গে কাউকে পাননি। মার খেয়েছেন বাইরে, মার খেয়েছেন ভিতরে। তাঁর প্রশাসনিক নীতি 'ডু ইট নাউ' যেমন ব্যর্থ, তাঁর শিল্পনীতিও তেমন একইভাবে ব্যর্থ। সিঙ্গুরে টাটার প্রকল্প হল না, সালিমরা বাড়ি ফিরে গেল, জিন্দালদের শালবনীতে কী হবে অনিশ্চিত, ২৩ আগষ্ট বেদিক ভিলেজ কাণ্ডের পর আই টি পার্কের প্রকল্প বাতিল হল। ২৪ বছরের টানা মুখ্যমন্ত্রীত্বে জ্যোতি বসু যতগুলি অপকর্মের বাড়বাড়ন্ত এবং সূচনা ঘটিয়েছিলেন, পরের ৭-৮ বছরে বুদ্ধদেববাবুকে তার সবগুলির ফল, অবশ্যই বিষফল, গিলতে হচ্ছে। জ্যোতি বসুকে বিশ্রাম দিতে হয়েছিল, বুদ্ধবাবুকে বিশ্রাম নিতে হবে।

> **“২৪ বছরের টানা মুখ্যমন্ত্রীত্বে জ্যোতি বসু যতগুলি অপকর্মের বাড়বাড়ন্ত এবং সূচনা ঘটিয়েছিলেন, পরের ৭-৮ বছরে বুদ্ধদেববাবুকে তার সবগুলির ফল, অবশ্যই বিষফল, গিলতে হচ্ছে। জ্যোতি বসুকে বিশ্রাম দিতে হয়েছিল, বুদ্ধবাবুকে বিশ্রাম নিতে হবে। ... বুদ্ধের যুদ্ধ এবং মমতার প্রতিহিংসা দুটোই নামের তাৎপর্যের বিপরীত। সঙ্কটে, গভীর সঙ্কটে পশ্চিমবঙ্গ।”**

অপরদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসাধারণত্বের দাবিদার হয়ে উঠতে চাইছেন ত্রিমুখী কর্মধারা নিয়ে, ভরসাযোগ্য কোনও টিম না করেই, তা যে কতদূর এবং কতদিন ভারসাম্যে থাকবে— তা ভবিষ্যদ্বানী করা যাচ্ছে না। তবে প্রত্যেক মানুষেরই কর্ম(মতা ও যোগ্যতার সীমা আছে। এবং সেই সীমা সম্পর্কে সচেতন থেকে সীমার মধ্যেই থাকতে হয় মানুষকে। মমতা ব্যানার্জীর (ে ত্রে বিষয়টি আরও কঠিন কারণ তার ভূমিকার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাকে নেতিবাচক ভূমিকায় মানুষ সফল হতে দেখেছে। এখন পুরোপুরি ইতিবাচক ভূমিকায় কাজ করতে হবে। অভ্যস্ত জীবনের বাইরে।

কয়েকটি নতুন রেলগাড়ী পুরনো ট্রাকে বা লাইনে চালানো সেই ইতিবাচক ভূমিকার প্রমাণ নয়।

বুদ্ধের যুদ্ধ এবং মমতার প্রতিহিংসা দুটোই নামের তাৎপর্যের বিপরীত। সঙ্কটে, গভীর সঙ্কটে পশ্চিমবঙ্গ।

কুরুক্ষেত্রে সূচনা বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার

(১ পাতার পর)

ভারতীয় কৃষিকাজকে। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "বিজ্ঞানীরা আজকের দিনে এমনও বলছেন যে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক শুধুমাত্র কৃষিকাজের জন্যই বিপজ্জনক নয়, এটা সমগ্র মানব সমাজকেও ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে।"

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা প্রসঙ্গে ভাইয়াজী বলেন, এই যাত্রা আমাদের দেশের মানুষের সামনে সঠিক প্রেক্ষিতে গো-রক্ষার পুরো বিষয়টিকে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। যাতে করে সমগ্র জাতি ভবিষ্যতে সঠিক দিশায় চালিত হতে পারে। এ নিয়ে সমগ্র কর্মকাণ্ডে আর এস এসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে তিনি মন্তব্য করেন, "এটা অনস্বীকার্য যে, মানব জাতির সুরক্ষা নির্ভর করছে গোরু ও গ্রাম রক্ষার ওপরে। যে কারণে আর এস এস এবং অন্যান্য সমমনস্ক সংগঠনগুলি এই যাত্রাকে সফল করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে গোরু, প্রকৃতি, গ্রাম বাঁচানোর জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে গৃহীত এই যাত্রাকে সফল করার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি।"

সমগ্র গো-গ্রাম যাত্রার 'মাস্টার মাইণ্ড' গোকর্ণ পীঠাধীশ্বর শঙ্করাচার্য রাঘবেশ্বর ভারতী অজ্ঞতার কারণে ক্রমাগত গো-হত্যা করা হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এদেশের কৃষকরা গোরুর তাৎপর্য ও তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা নিয়ে অন্ধকারে রয়েছে। রাঘবেশ্বর ভারতীর মন্তব্য, "ভারতীয় কৃষকরা জানেন না যে, একটা দুধ দেওয়া গোরু থেকে তাঁরা মাসে যতটা আয় করতে পারেন, তার থেকে অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে পারেন যে গোরু দুধ দেয় না (নন-মিল্কিং কাউ)— সেই গোরু থেকে। এই অজ্ঞতার কারণে কৃষকরা দুধহীন গোরুগুলিকে বেচে দেন কসাইদের কাছে। এই সত্যটা যেদিন তারা অনুধাবন করতে পারবেন যে, দুধহীন গোরু মানব জাতির কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ, সেদিন তাঁরা নিজেরাই গোরু বিক্রি বন্ধ করে দেবেন। এই উপলব্ধিটাই আগামীদিনে গোরুকে বাঁচানোর শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়াবে।" শ্রীভারতী জানাচ্ছেন, ভারতবর্ষের মানুষকে এবিষয়ে অবহিত করতেই এই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি মনে করছেন, আজকের দিনে এদেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান হতে পারে গো-কেন্দ্রিক জীবনযাত্রায়। ভাইয়াজী যোশীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে স্বামী রাঘবেশ্বর ওইদিনের সমাবেশে বলেন, "এই যাত্রা ভারতবর্ষের জনগণ ও বিশ্ববাসীকে গো-রক্ষা এবং সেইসঙ্গে গ্রাম ও প্রকৃতি রক্ষার জন্য সাধু-সন্তদের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে পরাধীন মানুষকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে।"

পেঝাওয়ার স্বামী শ্রীবিশ্ববেশাতীর্থ গোরুকে 'জাতীয় পশু'র মর্যাদা দেওয়ার দাবী জানান কুরুক্ষেত্রের ওই সমাবেশ থেকে। এই বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, "আমাদের দেশে সন্ত্রাস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, আমাদের জাতীয় পশু যেহেতু বাঘ। বাঘ হল সন্ত্রাসের প্রতীক, কিন্তু গোরু হল সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক। সেই কারণে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের সরকারের উচিত গোরুকে জাতীয় পশু হিসাবে মর্যাদা দেওয়া।"

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি অশোক সিংঘল সমাবেশে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে অনুরোধ করে বলেন, তাঁরা যেন শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কসাইয়ের কাছে গোরু বিক্রি না করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন, পৃথিবীর মাটিতে যতক্ষণ গোরুর রক্তপাত সংঘটিত হবে ততদিন কোনও পবিত্র কর্ম ফলপ্রসূ হবে না।"

কুরুক্ষেত্রে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা উপলক্ষে নির্মিত তোরণ।

এই যাত্রার কার্যকরী সভাপতি ও বিখ্যাত যোগবিজ্ঞানী ডঃ এইচ আর নগেন্দ্র বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রাকে আরেকটি স্বাধীনতা আন্দোলন রূপে ব্যাখ্যা করে বলেন, 'চরকা' যেমন স্বাধীনতা পূর্ব যুগে গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল তেমনি, আজকের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে গোরু অপর একটি সংগ্রামী প্রতীক রূপে চিহ্নিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, আধুনিক বিজ্ঞান ও যান্ত্রিকতা মানব জীবনে যা ক্ষতি করেছে তার থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় গো-রক্ষা।

ছোট মিঁয়া মইনুদ্দিন শবরীর মন্তব্য, গো-হত্যাকারীদের এবং গো-হত্যায় মদতদাতাদের কঠোর শাস্তির প্রতিবিধান ঘোষণা করতে হবে কেন্দ্রীয় আইনে। ওই একই দাবি জানিয়ে সি বি আইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর সর্দার যোগীন্দর সিং বলেন, "মহারাণা রঞ্জিত সিংয়ের আমলে গো-হত্যাকারীদের সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোত।" গ্রাম ও গোরু রক্ষা করতে দেশবাসীর সেই জাতীয় আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

সমাবেশে উপস্থিত থাকার কথা ছিল প্রণব পাণ্ড্যর। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সেদিন আসতে পারেননি। পরিবর্তে তিনি তাঁর পাঠানো বার্তায় বলেন, "গোরু, গঙ্গা, গীতা এবং গায়ত্রী হল ভারতীয় সংস্কৃতির চারটি মূল উপাদান। এই যাত্রার উদ্দেশ্য হল, হারিয়ে যাওয়া সেই সাংস্কৃতিক চেতনাকে পুনরুদ্ধার করা। সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গাঁথার জন্য আয়োজিত এই বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা ছুঁয়ে যাক ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামকে। সমগ্র গায়ত্রী পরিবার সর্বান্তকরণে এই যাত্রার সাফল্য কামনা করছে এবং যাঁরা একে সফল করার জন্য বিপুল উদ্যামে নেমে পড়েছেন তাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে।"

শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দ সরস্বতী খাঁটি কথাটাই বলেছেন। বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা প্রকৃত অর্থেই একটি মাইল ফলক। অন্তত এর সূচনা তো তেমন ইঙ্গিতই দিল।

সিপিএমের দেখানো পথেই জোট চাইছেন মমতা

(১ পাতার পর)

কারণ, মমতার মতে, কংগ্রেসকে আসন ছাড়ার মানে সি পি এমকে আসন ছাড়া। মমতা আজও বিশ্বাস করেন, কংগ্রেস-সিপিএম ভাই-ভাই। কথাটা যে মিথ্যা বুক বাজিয়ে সেকথা বলার সাহস রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের একজনেরও নেই। তবু মমতা সব জেনেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়েছেন তাঁর ক্ষুদ্র দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ণ বা জাতীয় রাজনৈতিক আদর্শে নয়। মমতার লক্ষ্য ছিল, কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী হওয়া। তাঁর রাজনৈতিক অঙ্কটা ছিল, যদি কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ পি এ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসে, তবে জোট শরিক হিসাবে তিনি রেল মন্ত্রকটি চাইবেন। মমতা সেকথা গোপনে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সোনিয়াও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরে নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর তাঁর দল এতগুলি বাড়তি মন্ত্রক পাবে তা মমতার ধারণা ছিল না। প্রকাশ্যে মমতা যতই বলুন না কেন, মন্ত্রিত্ব তাঁর কাছে ছেঁড়া চটি জুতোর মতো, আদতে তিনি জানেন যে, রেল মন্ত্রকই তাঁর প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র। আর সেই হাতিয়ারটি তিনি এখন যেভাবে ব্যবহার করছেন, তাতে প্রশ্ন উঠেছে যে, রেল মন্ত্রকটি কী শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য অথবা সারা দেশের। আপাতভাবে বিভিন্ন রেল প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গবাসী লাভবান হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তিনি চিরকাল রেলমন্ত্রী থাকবেন না। তখন রাজ্যবাসী বঞ্চিত হলে বলার কিছু থাকবে না।

কংগ্রেস সি পি এমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উলুবেড়িয়া ও শিলিগুড়িতে বোর্ড গঠন করেছে। এতে তৃণমূল নেত্রী ক্ষিপ্ত। অথচ তিনি গত এক দশক ধরে বলছেন, কংগ্রেস সি পি এমেরই 'বি' টিম। মমতা কী একবারও বলেছেন যে, জোট গড়ার পর প্রদেশ কংগ্রেস নেতা নেত্রীদের চরিত্র বদল হয়েছে? বলেননি। তবে শিলিগুড়ি কাণ্ডে তিনি এতটা প্রতিবাদী কেন? সহজ সরল উত্তর, উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসকে সি পি এমের বন্ধু চিহ্নিত করে বামবিরোধী জনমতকে তৃণমূলের পতাকার তলায় নিয়ে আসা। শিলিগুড়িতে সামান্য পুরবোর্ড গঠন করা নিয়ে কংগ্রেস যে রাজনৈতিক ভুল চাল দিয়েছে, মমতা সেই ভুলকেই হাতিয়ার করে উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছেন। মমতার পাখির চোখ মহাকরণ। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছেন একক শক্তিতে। বাস্তবে যে তা সম্ভব নয়, সেকথা তিনি জানেন। তাই জোট কিছুতেই ভাঙ্গতে তিনি দেবেন না।

ভোট বিভাজন রুখতে সি পি এম যেমন দুর্বল ও অতিদুর্বল বাম দলগুলিকে নিয়ে ফ্রন্ট গড়ে দাদাগিরি চালাচ্ছে, তেমনি মমতাও কংগ্রেস ও এক ডজন সাইনবোর্ডসর্বস্ব দল নিয়ে বামবিরোধী ফ্রন্ট গড়েছেন এবং দিদিগিরি চালাচ্ছেন। ভবিষ্যতেও চালাবেন। সি পি এমের অস্ত্রই এখন মমতার হাতিয়ার। সি পি এমের দেখানো পথেই হেঁটে মমতা জোট বজায় রাখবেন এবং কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করবেন। যেমন সি পি এম বামফ্রন্টের শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এবং সি পি আইকে এই রাজ্যে করেছে।

রাজ্য রাজনীতি

বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয় বাম রাজত্বের চার মূর্তি

নিশাকর সোম

এখন রাজ্য সি পি এম নেতৃত্ব বামফ্রন্টের ডাকে এক জনসমাবেশ করে নিজেদের শক্তি দেখাবার জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। এ হচ্ছে দলাদলির বিশ্বাসহীনতা — পরাজয়ের গ্লানিকে চাপা দেবার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। জমায়েতে জনসমাবেশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীরা দীর্ঘদিনের "অভ্যাস" মোটা চাঁদা তোলা বাদ দিয়ে রুটি সংগ্রহের কাজকে বিরক্তিকর মনে করছেন। তাঁদের বক্তব্য নিচের তলার কর্মীদের কোনও বক্তব্য গ্রহণ না করে উপর থেকে কর্মসূচীর পর কর্মসূচী চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেটা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারছেন না। তাঁদের মন্তব্য হলো — পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব ও সরকারি ব্যর্থতা দূর করার কোনও ব্যবস্থা না করে খালি "ক্ষমতা প্রদর্শন" করে শক থেরাপি-এর ব্যবস্থা হচ্ছে।

এক সময়ে রাজ্য পার্টির এক প্রবীণ নেতা আবদুল্লা রশুল বলেছিলেন, "আমাদের সংগঠনটি হল 'জেন্টল কলোসাস উইথ ক্লে ফিট' — কাদার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা "মহান" কাঠামো!" আমি বর্ধমানের লোক, আমি জানি রশুল সাহেব কি সৎ ছিলেন। সিপিএমে — তাঁর মতোন একজনও নেতা আর নেই। সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব আজ রাজনৈতিক সাংগঠনিক দিক থেকে শাঁখের করাতে পড়ে গেছেন।

যে-কথা এই কলামে লেখা হয়েছিল — পার্টি সংগঠন বনাম প্রশাসন। তারই একটি প্রকাশ দেখা গেল — আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে মুখ্যমন্ত্রী উইপ্রো-ইনফোসিস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্য পার্টি এবং কেন্দ্রীয় পার্টি সংগঠনে বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য-এর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠার পর বুদ্ধ বাবু মরুভূমির উটের মতোন বালিতে মুখ গুঁজে এই ঝড়কে মোকাবিলা করলেন। তিনি পার্টি সংগঠনের সভায় এবং কেন্দ্রীয় স্তরের প্রশাসনিক সভায় গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস হারিয়েছেন। তাই "অসুস্থতা"-এর অছিলায় সব সভাকে 'বয়কট' করেছিলেন। শেষমেশ সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে সীতারাম ইয়েচুরিকে ঘোষণা করতে হলো, বুদ্ধ বাবুর পদত্যাগের কোনও প্রশ্ন নেই। বুদ্ধ বাবু স্মরণ করুন, আপনি এই ইয়েচুরি-কারাতের সঙ্গে মিলে জ্যোতিবাবুকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিলেন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে।

> **"বামফ্রন্টের সভায় কার্যত বিমান-বুদ্ধ সম্বন্ধে অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। সিপিআই নেতা নন্দ ভট্টাচার্যের বক্তব্য যা হচ্ছে তাতে ২০১২ সালে বামফ্রন্ট শেষ হয়ে যাবে। কয়েকজন অর্বাচীন নেতৃত্বের ব্যর্থতায় আজ বামফ্রন্ট অবলুপ্তির পথে।"**

গত সেপ্টেম্বর মাসে সিপিএম-এর রাজ্য কমিটি সভাতে এক গৃহযুদ্ধের অধ্যায় দেখা গেল। বিমান-বুদ্ধ নিরুপম-বিনয় — এঁরা দুষ্ট চতুষ্টয় বলে বর্ণিত হয়েছেন। নিজেদের দোষকে ধামা চাপা দেবার জন্য রাজ্য কমিটির সভায় মন্ত্রী আবদুল রেজ্জাক মোল্লাকে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে বলার দরুণ সেনসর করা হয়েছে। তাঁর উপর "১৪৪ ধারা" জারি করা হয়েছে। যদিও রেজ্জাক এর কাজে কালিমা দেখা যাচ্ছে। তিনি ৫৭৬ একর জমি ২২ কোটি টাকায় বাটা কোম্পানী এবং হিন্দ মোটরকে বিক্রি করে দিয়েছেন। বাটানগরে বাটা সু কোম্পানীকে ১২ কোটি টাকায় ২৬২ একর জমি বিক্রি করা হয়েছে।

এই জমিতে বাটা কোম্পানী প্রমোটারি, শপিং মল, রিসর্ট করবে।

হুগলিতে হিন্দুস্থান মোটরসকে ১০কোটি টাকায় ৩১৪ একর জমি বিক্রি করা হয়েছে! জমির বাজার দরের ১০ শতাংশ দানে বিক্রি করা হয়েছে। জনসাধারণের সম্পদ কেন এভাবে নয়ছয় করে বিক্রি করা হল — সে কৈফিয়ত চাইবে কে? এই রেজ্জাকই আবার বলছেন — পার্টি থেকে প্রমোটার, দালাল ধান্ধাবাজ — অকর্মণ্যদের হঠাও।

তবে এবারের রাজ্য কমিটির সভাতে রাজ্য নেতৃত্ব তথা মুখ্যমন্ত্রী শিল্পমন্ত্রীকে তুলোধোনা করা হয়েছে। এই সভার পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা পার্টির সম্পাদক দীপক সরকার ও বাঁকুড়ার অমিয় পাত্র বলেছেন, পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এক ব্যর্থ নেতৃত্বের বোঝা। তাঁরা বলেন, উত্তরবঙ্গে পার্টির সাংগঠনিক দায়িত্ব ছিল মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য বুদ্ধ দেববাবুর হাতে। তাঁর ব্যর্থ নেতৃত্বের ফলে দার্জিলিং-এর পাহাড়ে সিপিএম-এর অবলুপ্তি ঘটেছে।

বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য শিলিগুড়িতে মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে ক্ষমতা 'ডেলিগেটেড' করে দিয়েছিলেন। তার নিট ফল হল উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়ি থেকে সিপিএম বিতাড়িত হবার পথে। রাজ্য কমিটির সভায় অশোক ভট্টাচার্য নিজের দোষ ঢাকার জন্য বলেছেন, যে পার্টির নিচের তলার কর্মী সমর্থকরা পার্টিকে ভোট দেননি। কেন দেননি? তা বলেননি। দেননি কারণ তাঁরা আর পার্টিকে বিশ্বস করতে পারছেন না। শোনা যায় শিলিগুড়িতে মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য নাকি "অশোক আগরওয়াল" হিসাবে অভিহিত?

রাজ্য কমিটির সভায় বক্তারা পিটিটিআই সমস্যার জন্য প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসকে দায়ী করেছেন। আর এহেন কান্তি বিশ্বাসকে বর্তমান বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে-এর উপর মনিটারিং করার জন্য বসানো হয়েছিল। পরে বিমান বসু কান্তি বিশ্বাসকে সরিয়ে নিজে এই দায়িত্ব নিয়েছেন। কান্তি বিশ্বাস প্রয়াত নেতা অনিল বিশ্বাসের লোক। যিনি নিজের পেনসন পাওয়ার ব্যবস্থা শিক্ষক পদ থেকে অবসর নেবার আগেই নাকি করেছিলেন। কান্তি বিশ্বাসের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমেরিকায় পড়াশুনা করেন বলে শোনা যায়। রাজ্য কমিটির সভায় সমস্ত জেলার নেতারা সমালোচনায় মুখর। তাঁদের একই কথা নেতৃত্ব-মন্ত্রীত্ব ব্যর্থ। বদল চাই — কিন্তু বিকল্প নাই!

ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কথায় মালিকদের তুষ্ট রাখার জন্য শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সিটুর সমর্থকগণ দলে দলে অন্য ট্রেড ইউনিয়নে চলে গেছে। অটো-ট্যাক্সি বাস-শ্রমিকদের বেশ বড় অংশ ইতিমধ্যে পৃথক সংগঠনে গেছেন। বাস এবং অটোর সমস্যা দীর্ঘ দিনের। রাজ্যের পরিবহন দপ্তর এই ব্যাপারে বছরের পর বছর কোনও উদ্যোগ নেয়নি — কেন? কারণ মালিক তোষণ?

কৃষক সভা সম্পর্কে রেজ্জাক-এর বক্তব্য, কৃষকদের স্বার্থ-বিরোধী কাজে কৃষক সভা জড়িত। তাই তিনি কৃষক সভার যাওয়া বয়কট করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে কৃষক ফ্রন্টের দায়িত্বে এমন নেতা আছেন — যাঁর সঙ্গে দু'দশক কৃষকদের সম্পর্ক নেই।

রাজ্য কৃষক নেতৃত্বে বর্ধমান গোষ্ঠীর হাতে। বর্ধমানের কৃষক নেতাদের পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি সুন্দরাইয়া ধনী কৃষকদের ফেরিওয়ালা বলেছিলেন। হরেকৃষ্ণবাবু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

মোট কথা সেপ্টেম্বরে, রাজ্য কমিটির সভাটি যুযুধান একাধিক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেছে। তাই কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিচের তলার কর্মীদের রাজনৈতিক ক্লাস নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ক্লাস নেবেন যাঁরা, তাঁদেরই আগে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দরকার আছে।

শুধু রাজ্য-কমিটির সভাতেই নয় — বামফ্রন্টের সভায় কার্যত বিমান-বুদ্ধ সম্বন্ধে অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। সিপিআই নেতা নন্দ ভট্টাচার্যের বক্তব্য— যা হচ্ছে তাতে ২০১২ সালে বামফ্রন্ট শেষ হয়ে যাবে। কয়েকজন অর্বাচীন নেতৃত্বের ব্যর্থতায় আজ বামফ্রন্ট অবলুপ্তির পথে। উল্লেখ করা প্রয়োজন অবিভক্ত পার্টিতে নন্দ ভট্টাচার্য, গুরুদাস দাশগুপ্ত প্রমোদ দাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রমোদবাবু গুরুদাস দাশগুপ্তকে পছন্দ করতেন।

বামফ্রন্টের সভায় ক্ষিতি গোস্বামী বলেন, বামফ্রন্টকে আজ ধনী তোষণের সংগঠন করে তোলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসাবে বিমান বসু ব্যর্থ। বামফ্রন্টকে না জানিয়ে বৈদিক ভিলেজ, উইপ্রো প্রভৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সিপিএম নেতৃত্ব এককভাবে নিয়ে চলেছে। বামফ্রন্টের শরিকদের অন্ধকারে রেখে সিপিএম নেতৃত্ব স্বৈরাচারীভাবে বামফ্রন্টকে কাগুজে সংগঠনে পরিণত করেছেন— এ বক্তব্য হল সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মঞ্জু কুমার মজুমদারের। সমস্ত শরিক দলের নেতৃত্বও একই সুরে সমালোচনা করেছেন।

এই বিতর্ককে এড়িয়ে গিয়ে বিমান বসুরা জমায়েত-এর কর্মসূচী ফ্রন্টে চাপিয়ে দিয়ে সিদ্ধান্ত করিয়েছে। সিপিএম নেতৃত্ব আজ রাজনৈতিক সাংগঠনিক ভুল-ভুলাইয়াতে ঢুকে পড়েছেন। বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। এখন শাঁখের করাতে পড়েছে— যেতে কাটছে, আসতেও কাটছে।

অন্য রকম

এসো কৃষ্ণ সাজি

পাশে যে ছবিটি দেখছেন, এর মায়ের নাম আমরা জানি না। ছেলেটির নাম — তাও অজানা। নামে কি আসে যায়। শেক্সপীয়ার বলেছিলেন, গোলাপকে যে নামেই ডাকো, সে একইভাবে গন্ধ বিতরণ করবে। বোরখা পরা এই ভদ্রমহিলা যে পর্দানসীন মুসলিম, এনিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। কিন্তু তিনি বোধহয় মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন, এদেশের সংস্কৃতিকে। তাই নিজের আত্মজকে অবতার পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাজে সাজিয়ে তুলেছেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। পাটনায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতার সময় এই অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্যটি নজরে এসেছে। যা পুরোটাই 'অন্যরকম'।

ছবিটি পি টি আই-এর সৌজন্যে।

বন্ধ চা-বাগানেও রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গ আবাসন করবে ত্রিপুরা বাগান বাঁচাবে

সংবাদদাতা ।। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ কোনও একটি শিল্পে কর্মরত বললে তা নিঃসন্দেহে চা-শিল্পকেই বোঝায়। বোধহয় চা-ই ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের পানীয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় একই মতবাদের অনুসারী রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকলেও চা-শিল্পের প্রতি দৃষ্টিকোণ কিন্তু ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে চা বাগান বন্ধ করে সেখানে একবারে বহুগুণ লাভ করার জন্য চা-বাগানকে টাউনশিপে পরিণত করার প্রয়াস চলছে। চাঁদমণি চা-বাগানের কথা সংবাদপত্রে বের হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চা-বাগান শ্রমিকদের অনাহার-অর্ধাহারে মৃত্যুর খবর বারবার সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করেছে। অথচ ত্রিপুরায় বামপন্থী সরকার কেন্দ্রের সাহায্য নিয়ে রাজ্যের ৫৮টি চা বাগানকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছে।

দেশের সর্ববৃহৎ কৃষিভিত্তিক শিল্প চা-কে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারও। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে 'স্পেশাল পারপাস টী-ফাণ্ড স্কীম' চালু করেছে। স্পেশাল পারপাস টী ফাণ্ড স্কীমের আওতায় (এস পি টি এফ) দেশের চা বাগানের দুই লক্ষ ১২ হাজার হেক্টর জমি আসবে। কেন্দ্রীয় এই স্কীমে ত্রিপুরার ছোট বড় ও মাঝারি ৫৮টি চা-বাগানই উপকৃত হবে। আগরতলায় টী - বোর্ড আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে টী - বোর্ডের চেয়ারম্যান বাসুদেব ব্যানার্জী এই তথ্য জানান। সেমিনারে রাজ্যের ৫৮টি চা-বাগানের মালিক সহ অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানগুলির মালিকরাও অংশ নেন। সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে টী-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীব্যানার্জী বলেন, একসময়ে ভারত বিশ্বে এক নম্বর চা-উৎপাদক দেশ ছিল। এখন ভারতের স্থান চতুর্থ। হাতে গোনা কিছু চা-বাগান ছাড়া সিংহভাগ চা-বাগানই নানা সমস্যায় ধুঁকছে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পারছে না। উৎপাদনেও বিশ্ববাজার দখলে শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। আধুনিকতা ও যন্ত্র ব্যবহারে উক্ত দেশগুলি বিশেষ সুবিধা নিচ্ছে। একসময় ভারতীয় চা বিশ্ববাজারে সমাদৃত ছিল। এখনও গোটা বিশ্বে ভারতীয় চা-র চাহিদা রয়েছে। বাগানগুলির

চা-বাগানের কঙ্কালসার শ্রমিক (ফাইল

সিংহভাগই বেশি পুরানো হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন মার খাচ্ছে। গুণমান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কয়েক লক্ষ চা বাগান শ্রমিক বেকার হতে বসেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় দেশের চা বাগানগুলিকে টিকিয়ে রাখতে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশেষ স্কীম — এস পি টি এফ চালু করেছে। এই স্কীমে চল্লিশ বছরের বেশি পুরানো চা-বাগানের ২.৫ শতাংশ বাগানের রিজুভিনেশন, আপ-রেটিং এবং ইন্টার প্ল্যান্টিং-এর জন্য মোট খরচের ৫০ শতাংশ স্বল্প সুদে ঋণ দেবে টী-বোর্ড, ২৫ শতাংশ ভর্তুকি পাবেন বাগান মালিকরা। বাগান মালিক ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ করবে। যদিও রাজ্যের চা-বাগান মালিকরা ভর্তুকি বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করার দাবী জানিয়ে চেয়ারম্যানকে মেমোরেণ্ডাম দিয়েছে টাইয়ের ত্রিপুরা শাখা। আগামী ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে এই স্কীমটি চালু থাকবে। পরবর্তীতে আরও ১০ বছর স্কীমটির সুযোগ বাড়ানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। এই স্কীমের সুফল হিসাবে দেশে চা-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ৭০ লক্ষ কেজি। রাজ্যের ৫৮টি চা-বাগানের ১৭০ হেক্টর জমি এই স্কীমের আওতায় আসবে। রাজ্যে এ ধরনের জাতীয় সেমিনার ১২৮ বছরে প্রথম হল। রাজ্যের চা-এর গুণমান বৃদ্ধির উপরও সেমিনারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাজ্যের চায়ের জন্য পৃথক লোগো ব্যবহারের বিষয়টি নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে। এদিকে চা-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে ও বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নিজেদের স্থান ধরে রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ স্কীম চালু করলে রাজ্য সরকার কোনও সাহায্য না করায় রাজ্যের চা শিল্প এগুতে পারছে না বলেও রাজ্যের প্রতিনিধিরা সেমিনারে অভিমত ব্যক্ত করেন।

রাজ্যে সম্প্রতি চা-বাগান শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করায় আর্থিক চাপ বেড়েছে মালিকদের। রাজ্যের চা-বাগান মালিকরা চা-এর উপর লাগু হওয়া এগ্রি ইন্টাস ট্যাক্স প্রত্যাহার, বিদ্যুৎ মাশুল হ্রাস করা, বাগানে পানীয় জল, বিদ্যালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, চাল-গমে ভর্তুকির দাবী বার বার জানানোর পরও রাজ্য সরকার কোনও ভূমিকা না নেওয়ায় ক্ষোভ ব্যক্ত করা হয়।

বিদেশী বহিষ্কার নিয়ে কেন্দ্র নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হাতে গোনা যে ক'জন বাংলাদেশী অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশী বলে আদালতে চিহ্নিত হয়েছে, তাদেরকেও ভারতের সীমানা পার করে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাতে ব্যর্থ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। তবে রাজ্য এজন্য

মনমোহন সিং

বি কে শর্মা

তরুণ গগৈ

কেন্দ্রের কাঁধেই পুরো দায়টা চাপাতে চাইছে। রাজ্যের বক্তব্য হল, বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি ডি আর কোনওমতেই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ-কারীদের ফেরৎ নিতে পারতপক্ষে রাজী হয় না। এরকম ঘটনার কথা বারবার রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রকে জানিয়ে, কেন্দ্রকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুরোধ জানালেও কেন্দ্র গা করেনি, আমল দেয়নি। অথচ, কেন্দ্র ও রাজ্যে দুটি সরকারই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন। অসম-পশ্চিমবঙ্গে বিহারে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের ঘাঁটি গেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার খবর এখন আর কোনও নতুন নয়। কেন্দ্র, রাজ্য সরকার এবং গুয়াহাটি ও দিল্লী হাইকোর্ট এব্যাপারে বারে বারে রায় দিয়েছে। কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনও সরকারই আন্তরিক সদিচ্ছা দেখায়নি।

আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে কোনও রাজ্য সরকারই সরাসরি কোনও বিদেশী সরকারের সঙ্গে এরকম বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারে না। কেন্দ্র সরকারকেই মধ্যস্থতা করতে হয়।

অসম রাজ্য সরকার এই বাংলাদেশী-দের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রকে ২৬ জুলাই ২০০৭, ২৬ অক্টোবর ২০০৭ এবং ৩০ মার্চ ২০০৯-তারিখে দফায় দফায় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে কেন্দ্র সরকারের তা কানে ঢোকেনি। এবছরের ১৮ মার্চ গুয়াহাটি হাইকোর্ট, রাজ্য সরকার ব্যাপক পরিমাণে বিদেশী অভিবাসীদের উপস্থিতির ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তা আদালতকে জানাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়। এদিকে সরকার তো যেকজন মুষ্টিমেয় বাংলাদেশীকে 'বিদেশী' বলে ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে তাদেরও বহিষ্কার করে উঠতে পারেনি। এর থেকে লজ্জার কথা আর কি পারে? কিছুদিন আগেই গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি বি কে শর্মা এক রায়ে বলেছিলেন — অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই অসমে সরকার কে গঠন করবে তার ফায়সালা করবে। তারপরও কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। অথচ এই কংগ্রেসীরাই সুযোগ পেলেই বিজেপি ও অন্যান্যদের আদালতের রায় মেনে চলার উপদেশ দিতে কোনও কসুর করেন না।

অসমে আম আদমী কা সিপাহী-র বাগাড়ম্বরই সার— রক্ষকই ভক্ষক

নিজস্বপ্রতিনিধি ।। অসমে রাহুল গান্ধীর 'আম আদমী কা সিপাহী' অভিযান ডাহা ফেল। প্রায় একবছর আগে রাহুল সারা ভারত জুড়ে 'আম আদমী কা সিপাহী' অভিযান শুরু করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে যুব কংগ্রেস নেতাদের 'আম-আদমী কা সিপাহী' গঠন করার নির্দেশ দেন। অসম সফরে গিয়েও অসমের যুব কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে অসমে জনসেবার উদ্দেশ্যে আম আদমী কা সিপাহী গঠনের সূচনা করে আসেন।

সাম্প্রতিক সেই সফরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যুব কংগ্রেসের সভা রাহুলের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হলেও দুর্নীতির শিকড় গভীরে প্রোথিত থাকার কারণে তা কাজে আসেনি। যুব কংগ্রেসের অনেক তাবড় তাবড় সর্বভারতীয় নেতা সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল জাতীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি যোজনা প্রকল্পের কাজে যাতে দুর্নীতি না হয়, তা দেখভাল করবে 'আম আদমী কা সিপাহী'। এই নীতি ঠিক হওয়ার পরই সব বেঠিক হয়ে যায়। এখন এই গড়বড় ও সিপাহীদের অকার্যকর হওয়ার পিছনে ওই যোজনা (এন রেগা) রূপায়ণে যে সকল নামজাদা কংগ্রেসী নেতাকর্তা যুক্ত আছেন তাদের নামেই অভিযোগ উঠছে। তারা চাইছেন না এভাবে সিপাহীরা তাদের উপর নজরদারি করুক।

অসমে আম আদমী কা সিপাহীদের তিন যুব নেতার নাম — জয় দাস, রাজু সিকদার এবং প্রতিমা দেবী। এঁরা সবাই 'রাইট টু ইনফর্মেশন' আইনে অসমে কয়েকটি নির্দ্ধারিত এলাকায় 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' এবং গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি যোজনায় কারা উপকৃত হয়েছেন, কি কাজ হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে এই তিন সিপাহী প্রকাশ্যে বলছেন, তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ আসছে। ভীতি প্রদর্শনও হচ্ছে। এজন্য নাম এসেছে স্থানীয় বিধায়কের ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা এবং সংসদীয় সচিব বিবেকানন্দ দোলুই-এর।

এরকম আরও অভিযোগ এসেছে — ওই ত্রয়ীকে ভীতি প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টি করে কাজই করতে দেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা সব নানাভাবে যুক্ত আছেন জন-উন্নয়ণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ণ-এর কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণের বিভিন্ন কাজে তাঁরাই চাপ দিচ্ছেন।

রাহুল গান্ধী

অভিজ্ঞ লোকেদের অভিমত হল — কংগ্রস সেবাদল জনগণের কোনও উপকারে আসেনি। তারা ছবির জন্য পোজ দিতেই ব্যস্ত থাকে অথবা নেতাদের সেবা করে। সিপাহী দলেরও সেই অবস্থা হবে।

দুর্ঘটনা রোধে ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই
শিবকাশীতে অসহায় বলিদান বাজি শ্রমিকদের

সংবাদদাতা।। কালীপুজোর মুখে ইতিমধ্যেই বাজার ছেয়ে গেছে বাজিতে। শব্দবাজি থেকে শুরু করে আলোর ফুলঝুরি ছোটানো হরেক কিসিমের বাজি এখন মিলবে কলকাতা থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বত্র। সব বাজিই যে এখানে তৈরি হয় এমন কিন্তু নয়। রাজ্যের বাজি কারখানায় উৎপাদিত বাজি ছাড়াও ভিনরাজ্য থেকেও বাজি আসে পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতা পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী, এখন আর ৬৫ ডেসিবেলের বেশি শব্দযুক্ত বাজি ফাটানো যাবে না। কিন্তু সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কালীপুজোর রাত্রে যথেচ্ছভাবে শব্দবাজি— যেমন চকলেট বোম, বড় সাইজের কালিপটকা (যার শব্দমাত্রা ৬৫ ডেসিবেলের বেশি) ইত্যাদি ফাটছে পুলিশের চোখের সামনেই। যাই হোক, এই শব্দ বাজি এবং কিছু আলোক বাজি বলা যায় বেশ খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই তৈরি করেন বাজি-কারিগররা। এর কারণ একটা যেমন সতর্কতা বা সাবধানতার অভাব, তেমন অপর একটা কারণ — যে বাজি কারখানাগুলো গড়ে তোলা হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তার উপযুক্ত পরিকাঠামোই হয়ত নেই। তবুও সরকার এবং ফায়ার ব্রিগেডের মদতে দিব্যি গড়ে উঠছে সেইসব অবৈধ বাজি কারখানাগুলো। এরাজ্যে যেমন অবৈধ বাজি কারখানা রয়েছে, তেমনি ভিন্নরাজ্যেও কিন্তু রয়েছে বেআইনি বাজি কারখানা। পশ্চিমবঙ্গে সেইসব কারখানাগুলিতে অকস্মাৎ দুর্ঘটনায় বাজি শ্রমিকের মৃত্যু কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিছুদিন আগে এই একই ধরনের ঘটনার সাক্ষী হয়েছে তামিলনাড়ুর ভিরুধুনগর জেলার শিবকাশী। শিবকাশী বাজি তৈরির জন্য বিখ্যাত। সেখানে গত ২০ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট এই ছোট্ট সময়টুকুর মধ্যে ৪৩ জন মারা যান, আহত হন বহু শ্রমিক। এই ঘটনায় আঙুল উঠছে তামিলনাড়ু সরকারের দিকে। বলা হচ্ছে, সরকারি অপদার্থতায় বাজি কারখানাগুলো অপরিকল্পিত, বেআইনি এবং সীমিত অগ্নি-নির্বাপন ক্ষমতার মধ্যে গড়ে উঠেছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে।

ভিনরাজ্য থেকে যে সমস্ত বাজি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে আসে, তার একটা বড় অংশই কিন্তু আসে তামিলনাড়ু থেকে। যাদের তৈরি করা বাজি কালীপুজো বা দীপাবলির রাত্রে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে আলোকজ্জ্বল করে তোলে, তাদের অন্ধকারময় জীবনের কিছুটা সুলুক সন্ধান করা যাক এবারে। ভাদ্দাক্কামপট্টি এবং এর সংশ্লিষ্ট কিছু গ্রাম যেমন করিসালপট্টি, ওথাপট্টি এবং পলিয়া কুন্দনপট্টি — এই সমস্ত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের রুটি-রুজির যোগাড় হয় বাজি তৈরি করেই। ওখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মাটি এতই রুক্ষ যে তাতে ফসল ফলাবার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা ছিল না কোনও কালেই। বট্টত্ত্বণ্ঠট্টত্তট্ট (তামিলনাড়ু ফায়ারওয়ার্কস অ্যান্ড অ্যামোরসেস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন)-এর বক্তব্য হলো, শিবকাশী বাজি কারখানা সংলগ্ন অন্তত পনেরোটি গ্রামে লাইসেন্সবিহীন একের পর এক বাজি কারখানা গড়ে উঠেছে। মোটামুটি যা তথ্য মিলছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, তামিলনাড়ুতে প্রায় ৬৩০টি বৈধ বাজি কারখানা রয়েছে।যার বার্ষিক টার্নওভার (আয়-ব্যয়ের হিসেব) অন্তত ৩৫০ কোটি টাকা। ওই সমস্ত কারখানায় কাজ করা কর্মীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজারের মতো। কিন্তু যে সমস্ত কারখানা উপযুক্ত পরিকাঠামো ও স্বল্প পরিসরের অভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়নি, সেখানেও কাজ করছেন একলাখের কাছাকাছি শ্রমিক। একটা কথা এপ্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার। যেসমস্ত বাজি কারখানাগুলো লাইসেন্সপ্রাপ্ত, সেই কারখানাগুলোর লাভের পরিমাণ মার খাচ্ছে স্রেফ ম্যানপাওয়ারের অভাবে। মনে প্রশ্ন জাগতে বাধ্য, তামিলনাড়ুর শিবকাশী এলাকা, সারা রাজ্যের প্রায় ৯৮ শতাংশ বাজি কারখানাই যে অঞ্চলে, তার আশ-পাশের এত অনুর্বর ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অন্য কোনও কাজের সুযোগ-সুবিধে নেই। যেখানে প্রভূত পরিমাণে মানুষজন বাস করেন। সেখানে আর যাই হোক সুলভ শ্রমিকের অভাব হওয়ার তো কথা নয়। বট্টত্ত্বণ্ঠট্টত্তট্ট-এ বিষয়ে একটা ভয়ানক কথা বলছে। তাদের দাবী, শিবকাশী সংলগ্ন এলাকার যে সমস্ত অদক্ষ শ্রমিক পরে ফায়ারওয়ার্কের কাজ শিখে যান, তারাই কিন্তু পরবর্তীকালে বেআইনি বাজি তৈরির কারখানায় যোগদান করেন। কারণ তাতে অনেক বেশি মাইনে পাওয়া যাবে। অবৈধ সেইসব কারখানাগুলোর মালিকরা বাঁকা পথে প্রচুর রোজগার করছে আর টাকা ছড়িয়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বাজি-শ্রমিকদের। পক্ষান্তরে, সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে তারপরে নিজের মোটাসোটা একটা লাভ রাখতে গিয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাটুকুও দিতে পারছে না। সুতরাং সব মিলিয়ে বাজি শিল্পে ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তামিলনাড়ুতে। সরকার সব দেখে শুনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

জীবনহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করে পেটের দায়ে এভাবেই কাজ করে চলেছে শিবকাশী এলাকার বাজি-শ্রমিকরা।

শিবকাশীতেএই অবৈধ বাজি কারখানার জন্য শ্রমিকদের মৃত্যুমিছিল কিন্তু থেমে থাকেনি। গত জুলাই মাসে নমস্কারিথানপট্টি অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণ কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারান ১৮ জন শ্রমিক। মাদুরাই জেলায় একটি কারখানায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল গত ৭ জুলাই। শিবকাশী-র ঘটনা তো সকলেরই জানা। এই শিবকাশীতেই গত মাসে একমাসেরও কম সময়ে পাঁচটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অন্তত পক্ষে ২৪ জন। জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়ানো বাজি শ্রমিকের চিতার আগুনই দীপাবলির রাতে ফুলঝুরি হয়ে জ্বলে না তো?

রাজ্যে রাজ্যে সঙ্ঘের সেবাকাজ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কয়েক বছর আগের ঘটনা। খাঁকি হাফ প্যান্টের এক বালককে দেখে এক অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, তোরা হাফ প্যান্ট পরে এসব কি করছিস রে! এতে দেশের তো কোনও লাভ হয় না। বালক স্বয়ংসেবকটি উত্তরে বলেছিলেন, কাকু, আমরা কি করি জানতে হলে শাখায় আসুন। ভদ্রলোকটি শাখায় গিয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। তবে একথা ঠিক, স্বয়ংসেবকদের সমস্ত শক্তির মূল উৎসই হল শাখা। সঙ্ঘ কি করে, কি করে না তা জানতে হলেও, প্রয়োজন আছে শাখার। তবে বছর দশেক আগেও সাধারণ মানুষের সঙ্ঘের সেবাকাজ সম্বন্ধে তিলমাত্র ধারণা ছিল না। আজকের পরিস্থিতি তা নয়। গণমাধ্যমের যুগে সাধারণ মানুষও জানেন সঙ্ঘের সেবা কাজ মানে 'নিঃস্বার্থ সেবা'। সুনামি কিংবা আয়লা- ত্রাণ কার্যে হাফ প্যান্ট পরিহিতদের আর দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হয় না। বরং প্রচারকে উপেক্ষা করে, তথা বাজারি সংবাদপত্রের কাছে 'মশলা খবর' না হয়ে নিরন্তর সেবকাজ চালাচ্ছে স্বয়ংসেবকরা। লক্ষ্য? লক্ষ্য — দেশ মাতৃকার বিপদে দেশকে রক্ষা। সঙ্ঘ বরাবরই প্রচারের বাইরে থেকেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সঙ্ঘের কাজ জনপ্রচার পায়নি। শুধু তাই নয়, সঙ্ঘের বেশির ভাগ সেবা কাজই 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' ব্যানারে না হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যানারে করা হয়েছে। যার মূল নিয়ন্ত্রক অবশ্য ছিল সঙ্ঘই, আর স্বয়ংসেবকেরা। এখন সমাজের সব স্তরেই সঙ্ঘের সেবা চালু আছে। কী শিক্ষা, কী স্বাস্থ্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন। যার মূল লক্ষ 'পরম বৈভবশালী' রাষ্ট্রের পুনঃনির্মাণ।

সম্প্রতি সঙ্ঘের অন্তর্বর্তী এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশজুড়ে ১, ৫৭, ৭৭৬টি প্রকল্প চালু আছে। যার মধ্যে ৫৯ হাজার ৪৯৮টি সেবা প্রকল্প শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। ৩৮,৫৮২টি সেবা কাজের কর্মসূচী সরাসরি স্বাস্থ্য বিভাগের ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও ৪২,৩০৪টি প্রকল্প সামাজিক ক্ষেত্রে ও ১৭ হাজার ৩৯৬টি সেবা প্রকল্প স্বনির্ভর প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে। সঙ্ঘ কাজের এই রিপোর্ট 'সেবা দিশা' ২০০৯ নামে এক পুস্তিকায় সম্প্রতি পুনে থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বছর পর পর এই রিপোর্ট পেশ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, সঙ্ঘের এই সেবা প্রকল্পগুলি সঙ্ঘের সহযোগী সংগঠনগুলির মাধ্যমেই রূপায়িত হয়। ৫৯,০৭৬টি প্রকল্প রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর দ্বারা পরিচালিত। ১৩,৯৬৯টি বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মাধ্যমে। এছাড়া অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দ্বারা ৭২,৩৭০টি, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ৪৬১ ও বিদ্যাভারতীর মাধ্যমে ৯,৬৮২টি প্রকল্প পরিচালিত। এছাড়াও ১ হাজার প্রকল্প দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর মাধ্যমে পরিচালিত ও ১৬৮টি প্রকল্প অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত।

সেবাকাজের সাতকাহন

সেবা কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র	রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী	বনবাসী কল্যাণ আশ্রম	বিশ্ব হিন্দু পরিষদ	ভারত বিকাশ পরিষদ	রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি	বিদ্যা ভারতী	দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট	অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ	সর্বমোট
শিক্ষা	২০৫০০	৩১৪৭	২৫৯২২	০	১৪৯	৯৬৮২	০	৯৮	৫৯৪৯৮
স্বাস্থ্য	১১৪৮৯	২৭৪১	২৩২০৪	১০৫০	৪১	০	০	৫৭	৩৮৫৮২
সামাজিক	১২০৪২	৬৭৯৫	২২৩৯৪	০	৬০	০	১০০০	১৩	৪২৩০৪
স্বনির্ভর	১৫০৪৫	১২৮৬	৮৫০	০	২১১	০	০	০	১৭৩৯২
সর্বমোট	৫৯০৭৬	১৩৯৬৯	৭২৩৭০	১০৫০	৪৬১	৯৬৮২	১০০০	১৬৮	১৫৭৭৭৬

সঙ্ঘের মধ্যে সেবাকাজ মূলত সেবা ভারতীর দ্বারাই পরিচালিত হয়। ১৯৯৫ সালে সেবা কাজের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় সেবা ভারতী। স্বয়ংসেবকরা সেবা ভারতীর দ্বারা দেশজুড়ে বিভিন্ন সেবা কাজ করে চলেছে। ১৯৯৫ সালে সেবা বর্ধিনী পুনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সেবা কাজের শুরু। ১৯৯৭ ও ২০০৪ সালে সেবা ভারতীর সেবা প্রকল্পের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

সঙ্ঘের সেবা কাজ শত বাধা সত্ত্বেও কিন্তু দমে যায়নি। এমন নয় যে সঙ্ঘের সেবার কাজ অন্যের ঈর্ষার শিকার হয়নি। কোথাও বিরোধী, কোথাও শাসকদল কোনও না কোনও ভাবে চেষ্টা করেছে বাধা দিতে। চেষ্টা করেছে স্বয়ংসেবকদের পিছু হটাতে। কিন্তু দুষ্কৃতীদের শত বাধা বিপত্তির মাঝেও সেবা কাজ করে চলেছে সঙ্ঘ। বেড়েছে গতি। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৭ সালে সেবা ভারতীর দ্বারা পরিচালিত সেবা কাজের সংখ্যা ছিল ১৫০৬৩টি। ২০০৪-এ তা বেড়ে হয় ৪৩,৩৮৬টি। ২০০৪-এর হিসাবে চলছে ১,৫৭,৭৭৬টি সেবা প্রকল্প। সমাজের সর্বস্তরে সেবা বর্ধিনীর সহায়তায় সেবা ভারতীর এই সেবা কাজ আজ দৃষ্টান্ত।

'সেবা দিশা ২০০৯' নামে রিপোর্টটি সেবা ভারতীর বাৎসরিক বৈঠকে প্রকাশ করা হয়। মীরাটে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সেবা দিশা প্রকাশ করা হয়। ২০০৪-এর তুলনায় এবার প্রায় ১ লাখ প্রকল্পের বৃদ্ধি ঘটেছে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেবা ভারতীর প্রকল্পগুলির শ্রীবৃদ্ধির খবরও সেবা দিশা মারফৎ জানা যাচ্ছে। আরোগ্য রক্ষকের মতো প্রকল্পের কাজ প্রত্যন্ত গ্রামেও পৌঁছে গেছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বিশেষ কিছু প্রকল্প চালু আছে। যেমন কেরলে বালগোকুলম, মহারাষ্ট্রের চার সূত্রী ধাম, তামিলনাড়ুর স্ট্রীট চিলড্রেন প্রভৃতি সেবা প্রকল্প যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছে। এছাড়াও দিল্লীসহ অন্যান্য মেট্রো শহরে শিশু-শ্রমিকদের শিক্ষার ওপর বিশেষ প্রকল্পও চালু আছে। এক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ বড় দৃষ্টান্ত।

সারণীর মাধ্যমে সঙ্ঘের সেবা প্রকল্পের চিত্র তুলে ধরা হল।

সাক্ষাৎকার ঃ সুনন্দ সান্যাল

শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যালঘু তোষণ আসলে ভোটের রাজনীতি

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামোত্তর পরিস্থিতিতে তিনি 'পরিবর্তনকামী' বুদ্ধিজীবী হননি। পরিবর্তনের দাবী করেছিলেন জমি-আন্দোলন পূর্ব পরিস্থিতিতেই। এমন একটা সময়ে সেই দাবী তুলেছিলেন বা ভুয়ো পি এইচ ডি ডিগ্রীধারীর বাংলাভাষা বিকৃত করার প্রয়াসের মুখোশটা এক লহমায় টেনে ছিঁড়েছিলেন, যখন শাসকদল সিপিএমকে চটানোর সাহস কয়েকজন বাদ দিয়ে বিশেষ কোনও বুদ্ধিজীবীই দেখাননি। যাঁর কথা হচ্ছে, তিনি বরাবরের পরিবর্তনকামী বুদ্ধিজীবী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল। কিন্তু বৈদিক ভিলেজ উত্তর কান্ডে তাঁর মনে হচ্ছে, এই 'ইপ্সিত পরিবর্তন' আদৌ 'বাঞ্ছিত পরিবর্তন' আনতে পারবে তো? সংখ্যালঘু ভোট-ব্যাঙ্ক রক্ষার তাগিদে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু 'অনভিপ্রেত' ঘটনা তাঁর যথেষ্টই বিরক্তির কারণ হয়েছে। এমনই অকপট, অন্তরঙ্গ, সুনন্দ সান্যাল-এর মুখোমুখি স্বস্তিকার প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

— সঃ স্বঃ

❑ একসময় বলা হতো সিপিএম শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকে পার্টিতন্ত্র বা দলতন্ত্র-এ পরিণত করেছে। বর্তমানে পি টি টি আই, যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং এর আগে বি এড —এই বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, রাজ্যের গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাই এই মুহূর্তে নৈরাজ্যে পরিণত। আপনি কিভাবে বিষয়টাকে দেখছেন?

● পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে— শিক্ষক নেই, শিক্ষাকেন্দ্রের অভাব, শিক্ষকবিহীন স্কুল, পরীক্ষায় অনাচার;মানে যতরকম, যাবতীয় গোলমাল আপনি ভাবতে পারেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সবগুলোই আছে। আসলে দলতন্ত্রের প্রভাব খাটিয়ে, শহরাঞ্চলের বহু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এরা পার্টির কাজে কুক্ষিগত করে রেখেছে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে এরা আবার পরীক্ষা-ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। সুতরাং যা হবার .....

❑ হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমবার প্রকাশিত পি টি টি আই-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে যদি তর্কের খাতিরে 'ভুল' বলে ধরেও নিই, যদিও এর জন্য হয়ত ফল ভোগ করবেন ৭৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। তবুও সেটা ধরে নিয়েই বলছি, কিছুদিন আগে দ্বিতীয়বারও যখন পি টি টি আই-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, দেখা গেল সেই একই ভুল করেছে রাজ্য সরকার। কি বলবেন একে? সদিচ্ছার অভাব? না অন্য কিছু?

> **"মুর্শিদাবাদে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হওয়া উচিত নয়। ওইখানে আলাদা করে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। .. এটা সম্পূর্ণ ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। এগুলো হওয়া উচিত নয়।"**

● সিপিএম ক্ষমতায় আসার তেত্রিশ বছর পরে আমি নিশ্চিত হয়েছি, যে এরা বেশিরভাগ শিশুকে বা ছাত্র-ছাত্রীকে অশিক্ষিত করে, নিরক্ষর করে রাখতে চান। যাতে করে এরা (সিপিএম) ভোট-জালিয়াত তৈরি করতে পারেন। যাতে করে এদের (ছাত্র-ছাত্রীদের) চাহিদা বেশি না হয়। যাতে এরা (সিপিএম) গুন্ডা, বদমাইশ তৈরি করে সমাজকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে পারে। — এটাই ওদের উদ্দেশ্য। কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃত শিক্ষা পেলে প্রকৃত পরিবর্তনের দাবীও তুলতে পারবে। সেইজন্যেই পি টি টি আই-এর মতন অঘটন ঘটতে দেওয়া হয়েছে।

❑ শিক্ষাক্ষেত্রেএইযেনৈরাজ্যচলছে আপনি তার জন্য সিপিএম পার্টিকেই দায়ী করছেন। কিন্তু বিশেষ করে কারুর নাম করতে চাইবেন এবিষয়ে? সেটা পার্থ দে হতে পারেন, সুদর্শন রায়চৌধুরী হতে পারেন, পবিত্র সরকার হতে পারেন।

● আপনি যাদের নাম করলেন তারা কোনও না কোনওভাবে কিন্তু-এর সঙ্গে যুক্ত। এই যে পবিত্র সরকারের নাম করলেন, তাঁর নিজের পি এইচ ডি ডিগ্রী না পেয়েও পেয়েছেন বলে রিডার হয়েছেন, প্রফেসর হয়েছেন, উপাচার্য হয়েছেন। এ জিনিস ভাবা যায় না। আপনি যেসব মন্ত্রীদের নাম বললেন তাঁর মধ্যে কিন্তু কান্তিবাবু (কান্তি বিশ্বাস) নেই। এই কান্তিবাবু বার বার গণশক্তিতে লিখেছেন, '৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে; বাজেট বরাদ্দ আগের তুলনায় ৪৪ গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মজার ব্যাপার, এই বরাদ্দের ৯৫ শতাংশই শিক্ষকের বেতন দিতে খরচ হয়ে যায়। এই শিক্ষকদের দিয়েই শাসক দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ভোটার তালিকা সংশোধন করানো হয়। সুতরাং একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

❑ নৈরাজ্যের আরেকটি দিক হলো, ইদানীংকালে কলেজগুলোতে লাগাতার ছাত্র-সংঘর্ষ। কি মনে হচ্ছে, সরকারের কোনও অ্যাজেন্ডা রয়েছে এর পেছনে?

● এর পেছনে একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত রয়েছে। এই কারণে এটা বলেছি — খেয়াল করে দেখুন এখন রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে এরা খুন ও ধর্ষণকে নিয়ে এসেছে। আগেকার দিনে যে রাজনৈতিক খুন হতো, সেটা ছিল বিক্ষিপ্ত ঘটনা। আসলে, কেন্দ্রীয়ভাবে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে ভয় দেখানোর কৌশল হিসাবে খুন ও ধর্ষণ গৃহীত হবে। তা না হলে কলেজ-ইউনিয়নগুলির নির্বাচনে ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে এত বড় বড় সব কান্ড হতো না।

❑ এবার রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসি। সাচার কমিটির সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়ে রাজ্য সরকার দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার মতো কয়েকটি বিদঘুটে কান্ড ঘটিয়েছে। যার একটি হলো মাদ্রাসা শিক্ষা। রাজ্যের ১২টি জেলায় সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অফিস ও বাকি ৭টি জেলায় সংখ্যালঘু সেল খোলা হয়েছে। ২০০৫-০৬ আর্থিক বর্ষে এই শিক্ষার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা এবং বর্তমানে তা বাড়তে বাড়তে ২০০৮-০৯ শিক্ষা বর্ষে ৩৬০.৩৭ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। এটা কতটা জাস্টি ফায়েড?

● এটা ঠিক যে এখন মাদ্রাসার কোর্সের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এটাও ঠিক, হিন্দু ঘরের বহু ছেলে-মেয়েও এখন মাদ্রাসায় পড়ছেন। কিন্তু আমি পরিষ্কার করে এটাই বলতে চাই, মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়ে হবে না। যদি মাদ্রাসায় হিন্দু ঘরের ছেলে-মেয়েরা যায়ও — এটাও বড় কথা নয়। মূল কথা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীও পুরোপুরি মাদ্রাসা শিক্ষাকে বৈধ বলে গণ্য করেননি। মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে — ঠিক আছে। কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলে বহু মাদ্রাসা সন্দেহজনকভাবে গড়ে উঠছে। বড় বড় বিল্ডিং সেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু এর টাকা আসছে কোথা থেকে কেউ জানে না। বলছে চামের টাকা। অর্থাৎ চামড়া বিক্রি করে নাকি এর টাকা উঠছে। কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েরা উপায়ন্তর না দেখে এইসব মাদ্রাসা শিক্ষার ফাঁদে পা দিচ্ছে।

❑ দৈনিক স্টেটসম্যানের গত ২৪ শে জুলাই-এর একটা রিপোর্ট বলছে, রাজ্য সরকার প্রতিটি খারিজি মাদ্রাসায় এমন একজন শিক্ষকের বেতনভার বহন করার কথা ভাবছে যিনি খালি ধর্মতত্ত্ব পড়াবেন। প্রসঙ্গত, আপনাকে বলি, এই খারিজি মাদ্রাসায় সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। বর্তমানে এরাজ্যে খারিজি উচ্চ-মাদ্রাসা ৮০৪টি, খারিজি প্রাথমিক মাদ্রাসা, যাকে বলে মক্তব, তার সংখ্যা ২৮০০টি এবং খারিজি হিফন মাদ্রাসা, যেখানে শুধু কোরান পড়ানো হয়, তার সংখ্যা ৩৫০-এর মতো। কি বলবেন একে?

● আমার বক্তব্য, ধর্মতত্ত্ব পড়াবার জন্য সরকার যদি একটা ব্যবস্থা করতে চায় করুক। তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সবকটা ধর্মকে এবিষয়ে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তার জন্য একটা ফান্ডিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। মানে তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার একটা বন্দোবস্ত থাকা জরুরী। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার নামে শুধুমাত্র মুসলমানদের... আমি মুসলমানদের উন্নতির সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কারণ তারা এদেশেরই অঙ্গ। এসব মেনে নিয়েই বলছি, ধর্মতত্ত্ব যদি শেখাতেই হয় তবে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে। এটা একটা কথা। আরেকটা কথা শুধু ধর্মতত্ত্ব দিয়ে কিছু হবে না, প্রয়োজন সুশিক্ষার, বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষার ভীষণরকম প্রয়োজন। একটি ধর্মকে যদি সরকার সুযোগ দেয়, তবে তা প্রতিটি ধর্মকে দিতে হবে। এবং সমানুপাতিক হারেই তা দিতে হবে। এগুলো হলো আসলে ভোট- ব্যাঙ্ক। এসব দিয়ে কোনও সম্প্রদায়ের কোনও উন্নতি হবে না। যে কোনও সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, মেধার বিকাশ আগে নিশ্চিত করা দরকার।

❑ আপনি জানেন — কলকাতা মাদ্রাসাকে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নাম হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আলিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাশও হয়ে যায়....

● আমি তো বললাম, এই যে সমস্ত কাজগুলো এঁরা করছেন — এটাকে 'ভোটব্যাঙ্ক' হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তাঁরা করছেন। সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর এটা করা হয়েছে। তার মানে, তাঁরা (রাজ্য সরকার) যখন দেখলেন, তাঁদের কাছ থেকে ভোটাররা সরে যাচ্ছেন, সংখ্যালঘুরা সরে যাচ্ছেন। তারপরে এইসব কাজ তাঁরা করেছেন। এটা আমার কাছে অনভিপ্রেত। এমন কান্ড হওয়া উচিত নয়। তবে এগুলো আমাদের প্রায়োরিটি (গুরুত্বের তালিকা) লিস্টে নেই। এখন প্রথম কথা হচ্ছে সিপিএম-কে সরাতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরে আমরা এগুলি নিয়ে ভাবতে পারব। তখন সিভিল সোসাইটি মানে সজ্জন সমাজের উচিত হবে, এইভাবে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে করে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা।

❑ কিন্তু আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গটা এই কারণেই এল। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তা তো করা হয়ই না। উপরন্তু সেখানে আরবী পরিভাষায় যাবতীয় কাজকর্ম চলছে। যেমন, উপাচার্যকে ওখানে বলা হচ্ছে আমির-ই-জামিয়া। সহ উপাচার্য হলেন শেখ-উল-জামিয়া। জাতীয় সংহতি, জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় চলতে দেওয়া উচিত?

● এর উদ্দেশ্য একটাই। সেই ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতি। এই রাজনীতি থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসতে হবে সজ্জন সমাজকেই।

❑ সেটা কি ২০১১-এর পরেই হবে?

● হ্যাঁ, এই জিনিসটা পরিবর্তনের পরেই হবে। আসলে, এখন এমার্জেন্সি বেসিসে (জরুরী ভিত্তিতে) যে কাজগুলো করতে হবে এ ব্যাপারটা তার মধ্যে আসছে না। এখন সবকিছুতেই রাজনীতি ঢুকে গিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির পেছনে যে গোষ্ঠীগুলো কাজ করছে, সেগুলো তাদের একদম নিজস্ব এজেন্ডা। কিন্তু সব মানুষের পক্ষ নিয়ে যে কাজগুলো হয় সেগুলো অবহেলিত হচ্ছে। এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সমস্যা।

❑ আলিগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চারটি শাখা খোলা হবে চারটি রাজ্যে। এনিয়ে দুটি প্রশ্ন উঠছে....

● আপনাদের মুশকিলটা কি জানেন। আপনারা সবকিছুই রাজনৈতিক ভাবে চিন্তা করেন। আমার বিশ্বাস, ধর্ম ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার রাস্তা। কিভাবে যাওয়া যাবে সেটা আমি বলতে পারব না। আমি তো বলেছিই, এসবই হলো ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি।

❑ আমি এ প্রসঙ্গে আপনার সাথে একমত। কিন্তু দু'টো ভিন্ন প্রেক্ষিতে দু'টো অন্য ধরনের প্রশ্ন আলিগড়ের ব্যাপারে উঠে আসছে। প্রথমত, আলিগড়ের শাখা মুর্শিদাবাদে খোলা হবে কেন?

● হ্যাঁ, এবিষয়ে আমি একমত। মুর্শিদাবাদে এটা হওয়া উচিত নয়। নজরুল ইসলাম এ বিষয়ে পরিষ্কার যেটা বলেছেন অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হওয়া উচিত নয়। ওইখানে আলাদা করে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। আমি তাঁর (নজরুল ইসলাম) সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। সেখানে অন্য কোনও বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কখনও হবে না। এটা ঠিক নয়। এটা সম্পূর্ণ ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। এগুলো হওয়া উচিত নয়। আমি ভাবছি সুশীল সমাজরা, সজ্জন সমাজ যদি সক্রিয় না হয় তবে এর কোনওদিনও সুরাহা হবে না।

❑ ঠিকই বলেছেন। আপনাকে আগেই বললাম, আলিগড়ের বিষয়ে দু'টো

(এরপর ৯ পাতায়)

এক দেশ এক শিক্ষানীতি চালু হোক

তারক সাহা

সম্প্রতি দেশের নতুন মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রী কপিল সিবালের এক বিবৃতি সারা দেশে এক নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। দেশের মানব সম্পদ তথা শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তিনি যা বলেছেন, তা হল— সারা দেশে এক শিক্ষানীতি চালু হোক — মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে রাজ্যে রাজ্যে যেসব শিক্ষা পর্ষদ রয়েছে তা ভেঙে পরীক্ষা ব্যবস্থা এক ছাতার তলে আসুক। বিষয় গুলি কপিলের মস্তিষ্কপ্রসূত হলেও যদি তা সরকারি স্তরে আইন হিসেবে সারা দেশে এক শিক্ষানীতি হিসাবে চালু হয় তাহলে অবশ্যই কপিলের এই প্রস্তাব প্রশংসনীয় এবং যদি সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তো কপিল দেশের শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রণী হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ষাট বছর অতিক্রান্ত হলেও সারা দেশে সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষানীতি চালু করতে পারল না এতগুলো সরকার। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা শিক্ষার বিষয়টা সংবিধানের যৌথ তালিকায় কেন যে সংযুক্ত করলেন তার কোনও যুতসই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বভাবতই কপিলের এই ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়ে গেছে। বিষয়টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা নিয়ে নেতারা রাজনীতির আঙিনা ছেড়ে জনগণের দরবারে নিয়ে যাক। নেতারা যখন জনতার হিতসাধনে যারপরনাই ব্যস্ত তবে কেন বিষয়টা জনতার হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন না? কপিলের এই ভাবনার পরিপন্থী স্বভাবতই বাম নেতারা। অন্য রাজ্য এনিয়ে তেমন শোরগোল না তুললেও বামেরা তাদের প্রথাসিদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে দিয়েছে, আর তারই জেরে কপিল তাঁর নিজের দলেই তিরস্কৃত।

কপিল কী এমন ভুল বলেছেন? রাজ্যে রাজ্যে যেসব শিক্ষা পর্ষদ রয়েছে রাজ্য ভেদে তাদের পাঠক্রম বেশ সুচিন্তিত। অন্যত্র আবার পাঠক্রম বেশ নিম্ন মানের। ফলে রাজ্যওয়াড়ি বাড়ছে শিক্ষা বৈষম্য। কোনও রাজ্যের পড়ুয়ারা চাকুরির বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এগিয়ে গেলেও অনেক রাজ্য বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের পড়ুয়ারা বেশ পিছিয়ে। এইভাবেই বাড়ছে বৈষম্য, ছাত্র অসন্তোষ। কখনও কখনও এই অসন্তোষ দাঙ্গার রূপ ধারণ করছে।

বামেরা কেন কপিল ভাবনার পরিপন্থী? বামেরা যে বত্রিশ বছরের অপশাসন চালাচ্ছে এরাজ্যে তার অন্যতম মূল ভিত্তি হল শিক্ষাক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টোল-পাঠশালা পর্যন্ত বামেদের জাল অতি পরিকল্পিতভাবে বিস্তৃত। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা সংসদগুলির সর্বোচ্চ পদগুলির পদাধিকারির নির্বাচন মেধা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে হয় না, বরং এঁরা নির্বাচিত হন মূলত দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে। কংগ্রেস জমানাতেও এরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা সংসদগুলিতে মেধা, যোগ্যতার ভিত্তিতে পদাধিকারীরা নির্বাচিত হতেন। এখন এঁরা নির্বাচিত হন আলিমুদ্দিনের নির্দেশে। একসময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হত অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। এখন বাম জমানায় এই বিশ্ববিদ্যালয়কে মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঙ্‌ক্তিতে নামানো হয়েছে। রাজনীতির জাল বিস্তারে বামেরা আরও নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছে এরাজ্যে। শিক্ষার মান নিয়ে এদের ভাবনা না থাকলেও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ক্ষেত্রে এদের ভাবনা বেশি।

যা হওয়া ছিল স্বাভাবিক, তা নিয়ে নতুন প্রস্তাব কেউ আনলে তা না ভেবে খামোকা বিতর্ক ওঠানো কী জরুরি? দেশ যখন একটা, সেখানে যদি একটাই সামরিক বাহিনী থাকে, সেখানে যদি একই বিদেশ নীতি থাকে তবে একই শিক্ষানীতি নয় কেন? সরকারের উচিত কপিলের প্রস্তাব সদর্থক দৃষ্টিতে ভেবে দেখা। কারণ দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি যদি একই সংসদের অধীনে আসে, একই পাঠক্রমে পঠন-পাঠন হয় এবং একই পাঠক্রমে পরীক্ষা নেওয়া হয় তবে শিক্ষার বৈষম্য অনেকটাই

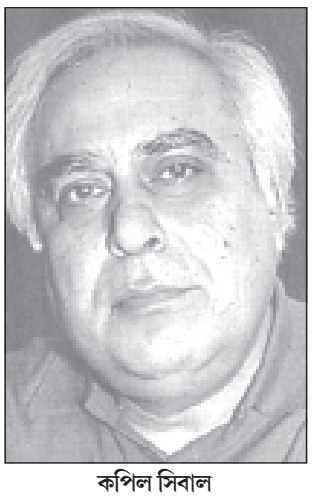

কপিল সিবাল

দূর হবে। যেটুকু বৈষম্য থাকবে সেটা হল মেধার বৈষম্য। একই পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা নেওয়া হলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পড়ুয়ারা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে এবং এমন কোনও অভিযোগ উঠবে না যে, অমুকে বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা বোর্ডের থেকে বা বিহারের বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ফল ভাল করেছে।

একই শিক্ষানীতি না থাকার ফলে শ্রেণী বৈষম্য বাড়ছে অনেক দ্রুত হারে। বামেরা এরাজ্যের মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল টাটা-বিড়লা আর পথের ভিখারী একই শ্রেণীভুক্ত করতে। পারেনি, বরং যা হয়েছে তা হল টাটা-বিড়লাদের সম্পদ আরও বেড়েছে আর ক্ষুদ্র চাষীরা আত্মহত্যা করছে। এরাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্র এমনই শ্রেণী বৈষম্যের এক উদগ্র উদাহরণ। গত বত্রিশ বছরের জমানায় ইংরেজি বর্জনের সুবাদে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষায়তনগুলির কারবার যেমন তড়বড়িয়ে বেড়েছে তেমন অন্য ব্যবসা বাড়েনি। পয়সাওয়ালাদের ছেলে-মেয়েরা ভিড় জমাচ্ছে ওইসব এলিট স্কুলগুলিতে। আর নির্ধনদের ঠাঁই গ্রামের, শহরের একদা খ্যাত অধুনা অখ্যাত স্কুলগুলিতে।

সারা দেশে একই বোর্ডের অধীনে, একই পাঠ্যসূচীতে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলে এইসব এলিট স্কুলগুলির রমরমা কারবার বন্ধ হবে। বন্ধ বা কম হয়ে যাবে বিদেশী মিশনারী পরিচালিত স্কুলগুলির শিক্ষা প্রসারের আড়ালে খৃস্টান ধর্মপ্রচারের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা। একই বোর্ডের অধীনে স্কুলগুলিকে আনলে বন্ধ হবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এতে সম্পূর্ণ বন্ধ হবে শিক্ষায় তালিবানীকরণ। শিক্ষার মাধ্যম সারা দেশ জুড়ে একই থাকলে বৈষম্য কমবে পড়ুয়াদের মধ্যে। প্রত্যন্ত গ্রামের নির্ধন চাষীর ছেলে-মেয়েরা যে ভাষায় পড়বে, দেশের বিভিন্ন মহানগরের পয়সাওয়ালাদের ছেলে-মেয়েরা একই ভাষায় পড়বে। এর দ্বারা বাড়বে কর্মসংস্থান। আর্থিক সহায়তার অভাবে যে সব গ্রাম শহরের পৌর পরিচালিত স্কুলগুলির যে দৈন্যদশা তা ঘুচবে অনেকটাই।

শিক্ষায় এই অরাজকতার সুযোগে বাড়ছে প্রাইভেট টিউশানি। কেন্দ্রীয় বোর্ডগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যেভাবে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসের বোঝা চাপানো হয়েছে, তাতে বাড়ছে প্রাইভেট টিউশানির রমরমা ব্যবসা। অন্য ব্যবসার সমান্তরালে এগোচ্ছে কোচিং ব্যবসা। আজকাল ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল ফলের সাফল্য কোনও স্কুলই দাবী করতে পারে না, যা বত্রিশ বছর আগে এরাজ্যে ছিল।

বামেরা কপিল থিওরির আরেকটা বিষয়ের ওপরও বিরোধিতা করছে। তা হল— সারা দেশে একই বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা পদ্ধতি চলে গেলে নাকি আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হবে। এর উত্তর হল ভারতের মতো বহুভাষার দেশে ইংরেজীর মতো সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা নেই। সুতরাং ত্রিসূত্রী ভাষার ব্যবস্থা করতে পারে কেন্দ্রীয় বোর্ড সারা দেশে। মূলত ইংরেজির সঙ্গে হিন্দী ও আঞ্চলিক ভাষা। এতে আঞ্চলিক ভাষাগুলি যথেষ্ট মর্যাদা পাবে।

কিন্তু কপিলের একটা ভাবনা অবশ্যই বেসুরো ঠেকছে। সেটা হল, দশম শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা ঐচ্ছিক করে দেওয়া। মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা অবশ্যই সর্বজনীন করতে হবে। কারণ মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষাই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতার দরজা খুলে দেয়। পাঠ্যসূচীর ভার যেমন লাঘব করতে হবে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত, তেমনি স্কুলগুলির ছুটি কমিয়ে বাড়াতে হবে কাজের দিনের সংখ্যা। সারা দেশে চালু হোক একটাই শিক্ষাবর্ষ ক্যালেণ্ডার। অধিক ছুটি মানে কম পড়া, সিলেবাস শেষ করতে না পারার অর্থ হলো প্রাইভেট কোচিংয়ের রমরমা। যদি কপিল সিবালের তথা মনমোহন সরকারের শিক্ষা সংস্কারের প্রকৃত অর্থে সদিচ্ছা থাকে, তবে নিরপেক্ষভাবে যোগ্য শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে অভিভাবকদের অভিমত নিয়ে এগোলে যথার্থ মঙ্গল হবে ছাত্রছাত্রীদের। এটা যত শীঘ্র সম্ভব দেশের পক্ষে ততটাই মঙ্গল— চালু হোক এক দেশ এক শিক্ষানীতি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যালঘু তোষণ

(৮ পাতার পর)

প্রশ্ন করব। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস মুর্শিদাবাদের যে জায়গায় গড়ে তোলা হবে, যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার সম্বন্ধে, সেটা হলো মূলতঃ কৃষি জমির ওপরই গড়ে উঠতে চলেছে প্রস্তাবিত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। কৃষকের স্বার্থে এনিয়ে আন্দোলন করবেন?

● তার থেকেও একটা বড় কথা হচ্ছে ওখানে বহু পরিযায়ী পাখী আসে। পরিযায়ী পাখীর জায়গাতে ওই ক্যাম্পাস কেন? ওটা কৃষিজমি কিনা সে সম্বন্ধে আমি কিন্তু কিছু জানি না। আমি যদি জানতে পারতাম ওটা কৃষিজমি। তাহলে ওই জায়গাটা কেন নেওয়া হবে — এই প্রশ্নটা করতে পারতাম। আমার এটাই মনে হচ্ছে, পরিবেশকে হনন করে ওই জায়গায় ক্যাম্পাস হতে চলেছে। এটা চলতে পারে না। আরও একটা কথা। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা .....। আমি হিন্দু অনুপ্রবেশকারী, মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করছি না। যে কোনও রকম অনুপ্রবেশকারীরা ওখানে আসছে। তবে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে অনেক গুণ বেশি। এতে টেররিজম (সন্ত্রাসবাদ) বেড়ে যাচ্ছে। ওখানকার ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারও (জনবিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য) ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। এভাবে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকলে সকলেই বিপদে পড়বেন। এ জিনিস বন্ধ করা দরকার। আমি বলব, বিজেপির মতো দল সুশীল সমাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

❑ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিজেপি-কে দায়ী করছেন?

● এই যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা (বিজেপি) কাজগুলো করছে এতে অনেক রকম মুশকিল তৈরি হচ্ছে।

❑ অনুপ্রবেশেরবিষয়েএকটাব্যাখ্যা রয়েছে। যেহেতু হিন্দুরা বাংলাদেশে উৎপীড়নের শিকার সুতরাং তাঁরা প্রাণ বাঁচাতে এদেশে আসতেই পারেন। এবং আমাদের সরকারের উচিত তাঁদেরকে আশ্রয় দেওয়া। জাতিসঙ্ঘকে উদ্ধৃত করে এটাই বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের হিন্দুদের এক্ষেত্রে 'উদ্বাস্তু' — এই আখ্যা দেওয়া উচিত। এবং বাংলাদেশী মুসলিমদের ক্ষেত্রে যেহেতু এই পরিস্থিতিটার সৃষ্টি হয়নি তাই তারা এদেশে অনুপ্রবেশ করলে 'অনুপ্রবেশকারী'— এই আখ্যাই তাদেরকে দেওয়া ঠিক হবে। মানবেন?

● যখন অত্যাচারের পরে হিন্দুরা আসবেন, সেই অত্যাচারগুলো আগে তাঁদের প্রমাণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে শুধু হিন্দু নন, খৃস্টান এমনকী মুসলমানরাও যদি অত্যাচারিত হয়ে আসেন তবে তাদেরকেও....।

❑ কিন্তু একথা তো সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণিত, যে হিন্দুরা ওদেশে অত্যাচারিত হয়েছেন।

● ঠিকই। কিন্তু দেখুন, আদাবানীজি ব্রজেশ মিশ্রকে খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশে তখন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে কচুকাটা করা হচ্ছিল। তে তখন তিনি (ব্রজেশ মিশ্র) গ্যাস গ্যাস করে ওদেশ থেকে চলে এলেন। তিনি এনিয়ে একটা কথাও কিন্তু সেদিন বলেননি। **শিক্ষানীতির হবু রূপকার মাননীয় শ্রী সুনন্দ সান্যালের কাছ থেকে এর উত্তরটা জানতে চাইছি।**

● প্রথম কথা হচ্ছে, আমি কোনও-ভাবেই কোনও সরকারি প্রয়াসের সঙ্গে জড়াব না। জনতার তরফ থেকেই আমি কথাগুলো বলব। দ্বিতীয়ত, আমজনতার তরফ থেকে আমি যে কথাগুলো বলার চেষ্টা করব তা হলো, প্রকৃত মানের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে যা করণীয়, প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটাতে যা যা দরকার সব করতে হবে।

❑ শিক্ষার প্রসঙ্গটায় ফিরে আসি। অনেকগুলি রাজ্যে এবং আমাদের রাজ্যেও ইতিমধ্যে 'জীবনশৈলী' শিক্ষার নাম দিয়ে একপ্রকার 'যৌনশিক্ষা'র পাঠক্রমকে চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে মূল্যবোধের শিক্ষা দেবার কোনও নামগন্ধ নেই। কি ভাবছেন?

● শিক্ষকদের প্রস্তুত না করে, একটা সমস্যা তৈরি করে... শিক্ষাতেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! টিভিতে একদিকে দুষ্কর্মের সব ছবি দেখানো হবে আর একদিকে বলা হবে এইডস ইত্যাদি ঠেকানোর জন্য এসব পড়ানো হচ্ছে। এসবগুলো চাই না। তবে ব্যাপারটা অত সহজে ডিল করা যাবে না। এটাও বলব, সব ব্যাপারে মরাল পুলিসিং (নীতি-শাসনকারীর ভূমিকা) করার দরকার নেই।

❑ এবার শেষ প্রশ্ন। শুধুমাত্র আমাদের পাঠকরাই নন। আপামর পাঠকমহল উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছেন ২০১১ সালে যদি পরিবর্তনের ঢেউ গঙ্গাপারের লাল বাড়িতে আছড়ে পড়ে তবে আগামী দিনে পরিবর্তনকারীদের শিক্ষানীতি কিরকম হবে। আমি সেই ❑ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

● স্বাগত।

চীন ভারতকে ঘিরে ফেলেছে

ভারতমাতার শিয়রে আজ মহাশমন। মস্তকের ডানদিকে পাকিস্তান ও বাঁদিকে চীন নামক দুষ্ট জল্লাদ খড়্গ হাতে আছে দাঁড়িয়ে। ভারতমাতার মুণ্ডুচ্ছেদে তারা প্রস্তুত। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আমরা জানি, দেশভাগের অব্যবহিত পরে পাক হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে কাশ্মীরের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে নেয় — যা এখন পাক-অধিকৃত কাশ্মীর। ভারত আজ পর্যন্ত তার হারানো জমি উদ্ধার করতে পারেনি। উল্টে পাকিস্তানই চাইছে পুরো কাশ্মীরের দখল নিতে। আর এই কাশ্মীরের দখল নিতে সে তিন তিন বার করেছে ভারত আক্রমণ। কিন্তু প্রতিবারই সে ভারতের কাছে হয়েছে পর্যুদস্ত। তাই সম্মুখ সমরে এঁটে উঠতে পারবে না। বুঝতে পেরে সে নিয়েছে ভারতকে অভ্যন্তরীণভাবে ধ্বংস করার এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে সে দায়িত্ব অর্পণ করেছে আই এস আই (পাক গোয়েন্দা সংস্থা)-এর উপর।

আই এস আইয়ের প্রচেষ্টা, মদত ও অর্থানুকূল্যে পাকিস্তানে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গড়ে তোলা হয়েছে হরেক কিসিমের ভারত বিরোধী উগ্র ইসলামিক জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। আর এইসব সংগঠনের ছত্রছায়ায় সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদীদের ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারতে অন্তর্ঘাত, গণহত্যা তথা ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে।

অর্থাৎ পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে বাঁকা পথে নেমেছে ছায়াযুদ্ধে। বিগত প্রায় একদশক ধরে ইসলামিক জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীরা ঠিক এই কাজটাই করে আসছে। ২৬/১১-এর আজমল কাসভদের মুম্বাই হামলা তারই প্রমাণ।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদী কমিউনিস্ট চীন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দখল নিতে উঠে পড়ে লেগেছে। চীন দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম প্রভৃতি রাজ্যকে নিজেদের বলে দাবী করে আসছে। তার দাবীর তালিকায় আছে দার্জিলিংও। ইতিপূর্বে চীন গায়ের জোরে দখল করেছে তাইওয়ান, জিনজিয়াং এবং স্বাধীন সার্বভৌম তিববতকে। '৬২ সালে তার কু-নজর পড়ে ভারতের উপর। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দখল করে নেয় আকসাই চীনসহ কাশ্মীরের লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশের কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূখন্ড। হতাহত করে হাজার হাজার ভারতীয় সেনা-জওয়ানকে। কিন্তু তাতেও তার সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বাদ মেটেনি। মাঝে মধ্যেই চীনা সৈন্যরা সীমান্ত লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়ছে অরুণাচল প্রদেশে। চীনা আগ্রাসনের এখানেই শেষ নয়, সম্প্রতি নয়াদিল্লীস্থিত চীনা দূতাবাসের মাসিক পত্রিকা 'নিউজ ফর্ম চায়না'র জুলাই সংখ্যায় অরুণাচল প্রদেশকে বিতর্কিত ভূখন্ড বলে মন্তব্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে — চীন এই তথাকথিত ভারতীয় অঙ্গরাজ্যটিকে স্বীকার করে না। এমনকী, ওই প্রদেশের উন্নয়ণেও বাধা দিচ্ছে সে। প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য খাতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ভারতের ৬ কোটি ডলার ঋণ প্রাপ্তিতেও বাগড়া দিয়েছে চীন। কিন্তু বিফল হয়ে ওই ঋণ দানকে চীনের স্বার্থের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছে ওই পত্রিকা। এই ঔদ্ধত্য ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে চীনের ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানো বৈ আর কী?

যদিও ইসলামিক মৌলবাদ ও কমিউনিস্ট মৌলবাদ পরস্পর বিরোধী, তবুও ভারত বিরোধিতায় তারা এককাট্টা। তাই ইসলাম ও কমিউনিজমের গলাগলির সুবাদে চীন পাক ভূখন্ডের বিভিন্ন স্থানে বসিয়েছে ভারতের দিকে তাক করে বহু ক্ষেপণাস্ত্র। পারমাণবিক বোমাসহ বিভিন্ন অস্ত্র নির্মাণে সে পাকিস্তানকে দিয়েছে গোপন তথ্য-প্রযুক্তি। উত্তর কোরিয়ার মাধ্যমে ইদানীং মায়ানমারকেও দিতে চলেছে ওই প্রযুক্তি। ওদিকে ভারত মহাসাগরের কোকোদ্বীপে ও (মায়ানমার) রয়েছে ভারতের দিকে তাক করে রাখা বিপজ্জনক চীনা ক্ষেপণাস্ত্র। আর এইভাবে চীন, পাকিস্তান ও মায়ানমার সম্মিলিতভাবে ভারতকে চারদিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে চীন এবং তাদের সাহায্য করবে এদেশের পাক ও চীনাপন্থী দেশদ্রোহী এজেন্টরা। সুতরাং চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল ভারতকে অচিরেই করতে হবে অবলম্বন। কারণ সে ভারতকে ঘিরে ফেলেছে।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

বঙ্গভঙ্গের উসকানি

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা, আর্থিক প্যাকেজ, ধর্মীয় শিক্ষার নামে হিংসার বাতাবরণ তৈরির পক্ষে মুসলিমদের ব্যাপক উৎসাহিত, উদ্দীপ্ত, উত্তেজনার খোরাক যোগাচ্ছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়, রেশন-কান্ড, বি পি এল, ভুয়া ভোটার, ভুয়া বিড়ি শ্রমিকের মতো বিষয় থেকে মন ও মগজকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে।

নিষিদ্ধ বেআইনি অস্ত্র ব্যবহার, যে কোনও হাইস্কুলকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার হুমকি, কান্দীতে ২১ আগস্ট হিন্দু স্কুল-ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা, পেট্রলপাম্পে বোমাবাজি, প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি, দারিদ্র্য বা আর্থিক টানা-পোড়েনকে নির্দেশ করে না। এসব ইসলাম সমাজের ঔদ্ধত্য, মুসলিম শাসন, শোষণ, অত্যাচারের দিক নির্দেশক। প্রতিবাদে মূক, বধির রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য — মুসলিম সমাজ অবহেলিত, দারিদ্র্য পীড়িত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অশিক্ষাই এর প্রধান কারণ। কিন্তু শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি তে অন্য প্রদেশ থেকে উর্দুভাষী জঙ্গিদের নিয়ে এসে আবাসিক মসজিদে উগ্র মুসলিম জেহাদী শিক্ষাদান, দারিদ্র্যের নামে ভিক্ষাজীবীদের দিয়ে গোয়েন্দাগিরি, রোজগারকৃত আয় বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র কেনায় ব্যবহার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, ইফতারে অংশগ্রহণ, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর নামে হিন্দু মহিলা মা-বোনেদের ইজ্জত হরণের ব্যবস্থা করে দিয়েও শান্তি নেই। অতি সম্প্রতি বেলডাঙ্গা-১ ব্লক কংগ্রেসের সভায় অতি সাহসী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুখেন হালদার, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বনতোষ ঘোষ বেলডাঙ্গা থানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সুতরাং যাঁরা বলছেন 'বঙ্গভঙ্গ আর নয়', তাঁরাই বঙ্গভঙ্গের প্রতি উসকানি দিচ্ছেন না কি?

প্রায় দিনই সংঘর্ষকে সরকারি প্রচার যন্ত্রে গোষ্ঠী সংঘর্ষ বলা হচ্ছে। অথচ রাজনীতির কর্তা-ব্যক্তিরা পরোক্ষে তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। কৃষকের ফসলের জন্য বীমা পূর্ববর্তী ইউ পি এ সরকার ঘোষণা করলেও রাজ্য সরকার আজও চালু করতে পারেনি। হিন্দুদের জমির ফসল লুঠ, গবাদি পশু দিয়ে খাইয়ে দেওয়া, গবাদি পশু হত্যা, নির্বিচারে বন ধ্বংস, গাছ কাটার জন্য পরিবেশবিদদের দেখা মেলে না। সরকারি প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছে না। মুসলিমদের তোয়াজ, অশিক্ষিতদের ধর্মীয় বাতাবরণে মগজ ধোলাই আর যাই করুক — অশান্তি বাড়াবে। কারণ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, সমাজবিরোধী প্রশিক্ষণ, ওই দুটো শব্দের পরিবর্তন জাতীয় বা গ্রামস্তরে কিছু মাত্র পরিবর্তন আনবে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জঙ্গিকার্যে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। আর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলা হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। মাদক, সোনা, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির চোরা-চালান অপব্যবহার বৃদ্ধি তে উৎসাহ দান আজ যে নেতাদের নেতৃত্বদানে উৎসাহ যোগাচ্ছে, কাল তাদের কাছেও তা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। শুধু 'চন্ডীপাঠে' গাড়ির কনভয় কতখানি নিরাপদে চলবে বলা মুসকিল। কারণ সুলতান মামুদ, মীরজাফর, ঔরঙ্গজেব তৈরি করলে বা উৎসাহ দিলে তারা আবারও গাড়ির গতিরোধ করবে।

অজয় মন্ডল, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

অখণ্ড ভারত ভাবনা

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অখন্ড ভারত ভাবনা' (১৭ ও ২৪ আগস্ট ২০০৯), প্রসঙ্গে এই চিঠি।

পৌরাণিক যুগে ভারতের সীমা কি ছিল এখন আর তা ভেবে লাভ নেই। অখণ্ড ভারত বলতে উত্তরে মানস সরোবর, দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা, পূর্বে বাংলাদেশ আর পশ্চিমে পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ভাবা যাচ্ছে না। আপাতত ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ মিলে যে অখন্ড ভারত তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মুসলমানদের কাছে রাজনীতি আর ধর্ম অবিচ্ছেদ্য। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য কে কে দায়ী চিহ্নিত করে আর কি লাভ, পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে কোরানের নির্দেশ, যা মানতে মুসলিমরা বাধ্য, বিরাট ভূমিকা নিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। নতুবা পাকিস্তান দাবীর পক্ষে মুসলমানেরা বিপুল সংখ্যায় ভোট দিত না। রাজনীতির চাইতেও ধর্মীয় বাধ্য-বাধকতার গুরুত্ব যে কম ছিল না তা নিম্নলিখিত কোরানের নির্দেশ থেকে ফুটে উঠবে।

কোরানের বিচারে অমুসলিম মাত্রেই কাফের, কিন্তু হিন্দুরা মহাকাফের। কারণ তাদের অধিকাংশই মূর্তি-পূজক ও ঈশ্বরবাদী বা অংশীবাদী। কোরান বলছে — (১) যারা আল্লা প্রেরিত আয়াত (উপদেশ, নির্দেশ) অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করে না তারাই কাফের (সুরা ৫ : আয়াত ৪৪)। (২) মূর্তি পূজকেরা যে পর্যন্ত না একমাত্র আল্লায় বিশ্বাসী হয় তাদের সাথে মুসলমানেরা যেন চিরশত্রুতা ও চির বিদ্বেষ বজায় রাখে (৬০:৪)। (৩) মুসলমান যেন মুসলমানকে বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু না বানায় (৪ : ১৪৪)। (৪) একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় ব্যতীত মুসলমানের পক্ষে কাফের বন্ধু গ্রহণ নিষিদ্ধ (৩ : ২৮)। (৫) আল্লা কাফেরের শত্রু (২ : ৯৮) এবং আক্রমণকারী (২:১৯)। (৬) মুসলমানের আনুগত্য শুধু তাদের ঊর্ধতন মুসলিম কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রযোজ্য (৪ : ৫৯)। (৭) মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাবার সুযোগ সত্ত্বেও যে মুসলিম কাফের সমাজে বাস করে পরে মারা যায় তার স্থান হয় নরকে (৪ : ৯৭-৯৯)। (৮) মূর্তির কদর্যতা থেকে মুসলমানরা যেন দূরে থাকে (২২ : ৩০)। (৯) যে খাদ্যবস্তুর উপর আল্লা ভিন্ন অন্য উপাস্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা খাওয়া মুসলমানের বারণ (২ : ১৭৩০। কোরানে এরূপ অজস্র নির্দেশ আছে যাতে মনে হয় হিন্দু-মুসলিমের সহ-অবস্থান কাম্য নয়। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্তরে হিন্দু-মুসলমানের মিত্রতার ভিত্তি মানবিকতা, ধর্মীয় বিধানের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই যা হার মানে। হিন্দু প্রধান ভারতের সাথে ইসলামিক পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শত্রুতা যে চলতেই থাকবে এটা আমাদের মনে রাখা উচিত। (দুই ভিয়েতনামের বা দুই জার্মানীর মিলনের পথে ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি) অখন্ড ভারত তাই সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়।

দেশভাগের ফলে হিন্দু-বিদ্বেষী কোটি কোটি মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন রাখা গেছে। লেখক যে আশা করছেন — 'পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব না থাকলে জেহাদী মানসিকতার অবসান হবে', তা দুরাশার নামান্তর মাত্র। জেহাদের অর্থ অমুসলিম জীবন-ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সেখানে মুসলিম জীবন-ব্যবস্থা কায়েম করা। (১০) সম মুসলিম যদি আল্লার পথে জেহাদে না বের হয় তবে আল্লা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন (৯ : ৩৯)। (১১) খাঁটি মুসলমান স্বীয় ধন-প্রাণ সহযোগে জেহাদ করে (৪৯ : ১৫), এবং আল্লার পথে দেশান্তরী হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় (৮:৭৪)। (১২) সাংসারিক জীবনের বিনিময়ে যারা পরলোকে কল্যাণ লাভ করতে ইচ্ছুক তারা যেন আল্লার পথে লড়াই করে, লড়াইয়ে সে মারাই যাক বা বিজয়ী হোক, আল্লা তাকে মহাপুরস্কার দেন (৪ : ৭৪)। জেহাদের নানা রূপ — পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ছাত্র ও বুদ্ধি জীবীরা "চোরা স্রোতে" ভারতীয় বুদ্ধি জীবীদের (যারা ঠেকেও শেখে না) ইসলামের স্বার্থে ডুবিয়ে মারবে না তো? (১৩) জান্নাতের বিনিময়ে আল্লা মুসলিমদের থেকে তাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি কিনে নিয়েছেন, আল্লার জন্যে তারা যুদ্ধ করে, তাই হত্যা করে ও নিহত হয় (৯:১১১)। অখন্ড ভারতের মুসলিমরা কি কোরানের এইসব নির্দেশ অমান্য করবে? সে গুড়ে বালি। তারা বরং অখন্ড ভারতকে একটা পূর্ণাঙ্গ মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করবে। (১৪) প্রতিমা-পূজা ত্যাগ করে যে ব্যক্তি আল্লা বিশ্বাসী হয় তার আল্লা নির্ভরতা অটুট থাকে (২:২৫৬)। তাই গত তেরশো বছরে ভারতের বুকে অগণিত সাধু-সন্ত-মহাত্মা, অবতার পরমহংস, বাবাজী, মাতাজী ও স্বামীজীর আবির্ভাব ঘটলেও অখন্ড ভারতে পাঁচজনে দু'জন মুসলিম; সনাতন ধর্মের অবক্ষয় হয়েই চলেছে। খৃস্টানরা স্পেনে ব্যাপক হারে মুসলিম নিধন করে নিজেদের দেশকে ইসলাম মুক্ত করেছিল। এদেশে কি তা সম্ভব? পরাবর্তনও সম্ভব নয়। অর্থাৎ ঋষি বাক্যানুসারে সনাতন ধর্মের বিজয় যে হচ্ছে না তা স্পষ্ট। (১৫) সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে আল্লাই মহম্মদকে কোরাণ পাঠিয়েছেন, তাতে অংশীবাদীরা যতই বিরক্ত হোক (৬১ : ৯, ৯ : ৩৩)।

ফলতঃ বিশ্বে আজ প্রায় ষাটটি ইসলামিক রাষ্ট্র শোভা পাচ্ছে। এমনিতেই নানান সমস্যায় ভারত জর্জরিত। 'অখন্ড ভারত ভাবনা' নিতান্তই বাস্তবতাহীন।

দীপঙ্কর হোম চৌধুরী, কল্যাণী, নদীয়া।

ভারত ভাগ ও শ্যামাপ্রসাদ

গতকাল ৮ আগস্ট বর্তমান পত্রিকায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বিজেপিকে কটাক্ষ করে চলেছেন। ভারত ভাগে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বড় ভূমিকা ছিল। দ্বিতীয়ত পন্ডিত নেহরু শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রেখে গিয়েছেন যা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ইত্যাদি। যশোবন্ত সিং তার হালের বইতে নাকি নেহরুকে ভারত ভাগের জন্য দায়ী করা হয়েছে বলে প্রণববাবুর উষ্মার কারণ।

না — প্রণববাবু যশোবন্ত সিং কি লিখেছেন আমি জানি না, আর জানার ইচ্ছাও আমার নেই। ভারত ভাগের জন্য দায়ী (১) সুচতুর বৃটিশ সরকার, (২) নেহরু তথা কংগ্রেসী নেতাদের গদীর লোভ, (৩) জিন্নাহ'র প্রধানমন্ত্রী হওয়া অন্যথায় পাকিস্তান দাবী (৪) মহাত্মা গান্ধীর দোদুল্যমানতা (আমার মৃতদেহের উপর দেশ ভাগ হতে পারে, অন্যথায় নয়, (৫) নেতাজীসহ বাংলা বিপ্লবী নেতৃত্বের মৃত্যু ও অনুপস্থিতি (৬)গান্ধীজীকে এড়িয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে নেহরু কর্তৃক ভারত ভাগের প্রস্তাব পাশ ইত্যাদি কারণগুলি প্রধান বলে মনে হয়।

প্রণববাবুর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এখনও কিছু বেঁচে-বর্তে আছেন। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় তারা মনে করেন (সিপিএম-নয়) শ্যামাপ্রসাদ, শরৎ বসু ও তৎকালীন নেতৃত্বের সঙ্গে ভারত বিভাগ রুখতে অল্প চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছিল উপরোক্ত কারণগুলির জন্য।

দ্বিতীয়ত — প্রণববাবুর মতে নেহরু যা রেখে গিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে বলি, ধর্মনিরপেক্ষ নয় — গোষ্ঠী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে পণ্ডিত নেহরু মিশর, যুগোশ্লোভিয়া ও ছোট রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি দল গড়েছিলেন। আর রাশিয়াকে বন্ধু ও চীনকে ভাই বানিয়ে ফেলেছিলেন।

আমরা ক্রুশ্চেভ, বুলগানিনকে নিয়ে কলকাতায় মাতামাতি করেছি। হিন্দী চীনি ভাই ভাই করে মাতামাতি করেছি। কিন্তু ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণে পন্ডিত নেহরুর বৈদেশিক নীতির দফারফা হয়েছে। আর রাশিয়ার পতন আরও ত্বরান্বিত করেছে নেহরু নীতির ব্যর্থতা। আর পাকিস্তান চীনের ও আমেরিকার সাহায্যে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আমদানী করছে আর উগ্রপন্থী পাঠাচ্ছে। নেহরুর প্রায় অকাল মৃত্যু (খুব সম্ভবত, ১৯৬২) শুধু চীনের বেইমানীর কারণে এতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে নেহরু বা গান্ধী পরিবারে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা তো প্রণববাবুর মতো অনেক মন্ত্রী-সান্ত্রী ও আমলার তোষামোদ দেখে বুঝতে পারা যায়।

তবে একটা কথা প্রণববাবুদের বলি, শ্যামাপ্রসাদ বাংলার বাঘ আশুতোষের পুত্র। তিনি ভারত ভাগ ঠেকাতে পারেননি কিন্তু পাকিস্তানকে দেওয়া বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ অংশ কেড়ে ভারতের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীরের জেলে মৃত্যুর সন্দেহের কোনও নিরসন করতে পারেনি তৎকালীন ভারত ও কাশ্মীর সরকার। তাই তাঁর মা চিঠিতে নেহেরুকে লিখেছিলেন — You are afraid to face facts.

বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।

তন্ত্র ও বেদ মুখে

শ্রীশ্রী দুর্গা ও মহাকালিকা শিবশক্তি

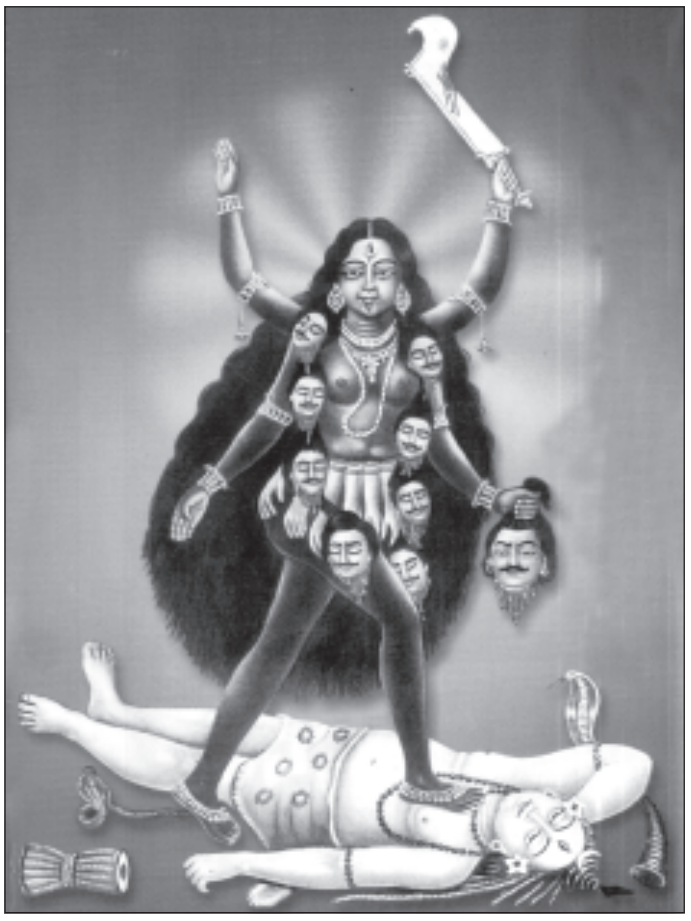

ভারতবর্ষ। আমাদের আরাধ্য জননী। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আগামী ও বর্তমান দিনে দেশ জননী হবেন উপাস্যা। ভারতে প্রচলিত প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যায় সকলের একমাত্র লক্ষ্য পরম পুরষার্থ বা মোক্ষলাভ। কিন্তু তন্ত্র মতে পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গেও অন্য তিনটি পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম) অনায়াসে সাধকের করকমলগত হওয়া সম্ভব।

বেদান্তভাষ্যে শ্রীকণ্ঠ বলছেন, বেদ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের দ্বিজদের জন্য, আর তন্ত্র-শাস্ত্র আপামর সকলের জন্য।

হিন্দু ধর্মের দুটি সমান্তরাল ধারা ভারতবর্ষে বয়ে চলেছে। একটি বেদ ও অপরটি তন্ত্র। বৈদিক ধারায় যাগযজ্ঞ, বেদাধ্যয়নে দ্বিজ ভিন্ন অন্য বর্ণের কোনও অধিকার নেই। তান্ত্রিক ধারা বা তন্ত্র ধারায় যোগ্য হলেই জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে অধিকারী।

যোগ্যতা অধিকার তন্ত্র সাধন পদ্ধতিতে নির্বাচন মাপকাঠি। নারীও কোনও জায়গায় বঞ্চিত নন। সাধনায় অধিকারী ভেদে আছে বিভিন্ন স্তর। কারণ সব মানুষের সামর্থ্য, মানসিক বিকাশ ও শারীরিক গঠন এক রকম নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে তন্ত্রের অধিকারী বিষয়ক ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞান সম্মত। তান্ত্রিক সাধনা এটিই অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

মহাঋষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ১৭টি পুরাণ রচনার পরও মনের তৃপ্তি আসছিল না। তখন মনে জাগল যে তিনি মা ভগবতীর পরমতত্ত্ব বর্ণনা করেননি। এইরূপ ভেবে তিনি নগাধিরাজ হিমালয় পর্বতে উপরিভাগে অবস্থান করে শ্রীশ্রী দুর্গার কৃপালাভের জন্য করলেন কঠোর তপস্যা। মহাদেবী তপস্যায় পরিতুষ্ট হলেন, আকাশবাণী হল — 'তুমি ব্রহ্মলোকে যাও, তথায় মূর্তিমতী শ্রুতিগণের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার ঘটবে। আর তাদের সহায়তায় আমি তোমার প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয়ীভূতা হব।'

সেই আকাশবাণী অনুসারে ব্যাসদেব ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়ে, মূর্তিমন্ত বেদচতুষ্টয় দেখতে পেয়ে প্রণামান্তর জিজ্ঞাসা করলেন —

'অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্ব কি?

বেদচতুষ্টয় হলেন মূর্তিমন্ত। উত্তরে তাঁরা একে একে বলতে লাগলেন অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্ব।

পুরুষ প্রধান বৈদিক সাহিত্য। এতে অবশ্য মাতৃদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় — রাত্রি ও ঊষা। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে মাতৃকাশক্তি আদিশক্তি দেবতা হিসাবে স্বীকৃত।

"জন্মকালেচ জননী, স্নেহ কালেচ কন্যা কী।

ভার্যা ভোগায় সম্পৃক্তা, অন্ত কালেচ কালিকা।"

একই কালী জগতে গর্ভধারিণীরূপে জন্ম দেন, কন্যারূপে স্নেহ গ্রহণ করেন, ভার্যারূপে ভোগের বিষয়ভূতা হন এবং দেহান্তের সময় কাল-কলন কর্ত্রীরূপে কোলে স্থান দেন।

জগতে প্রত্যক্ষ দুটি সত্য সূর্য উদয় ও সূর্যাস্তের মতো — একটি ভগবান ও দ্বিতীয় মৃত্যু। আগমশাস্ত্রে জীব কীভাবে দেহান্তে মোক্ষ পায়, তার বিস্তৃত আলোচনা ও সাধন পদ্ধতি আছে।

তারপরে বেদ (শ্রুতি) গণের সহায়তায় মা মমতাময়ী শ্রীশ্রী দুর্গা মহামায়ার প্রত্যক্ষ দর্শন, তাঁর নানা বিভূতি ও লীলা-বৈচিত্র্য দর্শন করে শ্রীশ্রী বেদব্যাসের (শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষির) সংশয় ছেদ হয়ে নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। তিনি হন কৃতকৃতার্থ আর বদরিকা আশ্রমে ফিরে রচনা করেন দেবী ভাগবত। শ্রীমদ্ দেবী ভাগবত বলছেন — ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বলছেন, 'যিনি শুদ্ধ সনাতনী মূল প্রকৃতি, তিনিই সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মএবং তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের যথাক্রমে কর্তা। নানাব্রহ্মান্ডবাসী এইরূপ কোটি কোটি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বরের আরাধ্য পরিপূর্ণ অব্যয় দেবতা শ্রীশ্রী দুর্গা। দেবর্ষি নারদ মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলে মহেশ্বর এই উত্তর দেন।

বৌদ্ধ দেব ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ।

পরম্পরা

ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর

অন্যদিকে তন্ত্রাচার্যগণের ত্রিরত্ন — শিব, শক্তি এবং বিন্দু। বেদান্তের মায়া এবং তন্ত্রের মহামায়া এক নন। বেদান্তের মায়ার কোনও পারমার্থিক সত্তা নেই। কিন্তু তন্ত্রের মহামায়া স্বয়ং ব্রহ্মময়ী, পরমেশ্বরী শ্রীশ্রী দুর্গা।

যোগমায়া মহাযোগিনী, অসীমের সঙ্গে সসীমের সংযোগ সাধিকা পরাশক্তি। তিনিই নিরাকার ব্রহ্মওঁকার।

ওঁ (প্রণব — অ+উ+ম+চন্দ্রকলা — প্রকৃতি নিয়ে ওঁ কার অকারে ব্রহ্মা, উ-কারে বিষ্ণু, ম-কারে মহেশ্বর — এই তিনদেবতা। অকার = নাদরূপ, উকার = বিন্দুরূপ, ম কার = কলারূপ। এদের সমষ্টি ওঁকার জ্যোতিরূপ বা নাদরূপ বোঝায়। এঁর মধ্যে তিনশক্তি — ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এবং তিনগুণ — সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ নিহিত। এই জন্যই একে 'ত্রয়ী' বলা হয়। উপনিষদে আছে 'ত্রিপাদ স্যামৃতং দিবিঃ।' আবার কুণ্ডলিনী শক্তির ত্রিপাদ — পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা — স্বর্গলোকে এবং রহস্যলোক হৃদয়ের মধ্যে স্থিত এবং একপাদ (বৈখরী বাক্) ভূলোকে প্রকাশিত।

বিশ্ব বিশ্রুত বৈদান্তিক একদা শক্তিতত্ত্বে ঘোর অবিশ্বাসী শিবাবতার শঙ্করাচার্য ১০৩ শ্লোকে শ্রীশ্রী জগন্মাতা দুর্গার আদিশ্লোক —

'শিব শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভাবিতুং

নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমদি।

অতস্ত্বামারধ্যাং হরিহর বিরিঞ্চি হ্যপদিভিরপি

প্রণস্তুং স্তোতুং বা কথমকৃত পুণ্যঃ প্রভবতি।

মাতঃ (ভবানী) শিব যদি শক্তিযুক্ত হন, তবেই তিনি নিজ প্রভুত্ব রক্ষা করতে সক্ষম, অন্যথা শক্তি বিরহিত হলে প্রভুত্ব দূরে থাকে। আত্মা অস্তিত্ব রক্ষা করতে নিজ নয়ন স্পন্দনে অসমর্থ। পক্ষান্তরে তন্ত্র মতে 'শক্তি' শব্দের ই-কার শিব যতক্ষণ শক্তিযুক্ত ই-কার বিশিষ্ট ততক্ষণই শিব শক্তিবিরহিত (ই-কার হীন) হলে শিব আর তখন শিব নাই। নিস্পন্দ শব। অতএব তুমি জগদারাধ্য হরিহর বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) প্রভৃতিরও আরাধ্যা আদ্যশক্তি, মা!

তন্ত্রাচার্য অভিনবগুপ্ত 'তন্ত্রালোকে' লিখছেন, যখন এই শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব পরস্পরের প্রতি উন্মুখ হন, তখন উভয়ের যামল রূপ আবির্ভূত হয়েই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা। যামলতত্ত্ব, আনন্দ শক্তি। এটি বিশ্বময় হলেও বিশ্বোত্তীর্ণ। যামলতত্ত্ব-পরা পরাৎ পরং তত্ত্বম্ — শিবতত্ত্ব ও শক্তিত্ত্ব অপেক্ষা পূর্ণতত্ত্ব।

তন্ত্রে কুণ্ডলিনী শক্তি বেদবর্ণিত সর্পর সঙ্গে অভিন্ন। সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতা সাড়ে তিন প্যাঁচ দিয়ে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ যা মূলাধারে ত্রিকোণে অবস্থিত তাকে বেস্টন করে আছে। যথা সাপ সাপুড়ের ঝাঁপির মধ্যে থাকে মাথা নীচু করে।

মুলাধার পদ্ম হতে নিঃসৃত রস মানুষের বংশ করে বৃদ্ধি। আয়ুর্বেদে এটি রেতঃ, বীর্য বা 'Sperm' নামে কথিত। এর মাঝে আছে শুক্রকীট বা 'Spermatoza' যার আকৃতি ফণাসহ সাপের মতো।

বিন্দুর অবস্থান আছে, কিন্তু আয়তন নেই। 'বিন্দুতে অথ বা প্রকাশয়তে অনেন ইতি বিন্দুঃ।'

বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন 'বিন্দুই শুক্রকীট স্থূলে। এঁর গতি 'Positive Energy'র দিকে।

ন অদতি ইতি নদেঃ। এর গতি 'Negative Energy'-র দিকে। এটির স্থূলরূপ ডিম্বকীট বা স্ত্রী বীজ। নাদকে বৃত্তের চাপ প্রকাশ করা বা বোঝানো হয়। প্রথমে মনে হয় প্রকৃতি যেন পুরুষকে গ্রাস করে বৃহত্তর রূপে প্রসব করেন। তন্ত্র হতে আমরা জানতে পারি যে প্রকৃতিই সাকাররূপে নিরাকার ব্রহ্মকে প্রকাশ করছেন। মস্তক প্রণত করে বা স্তর করতে অকৃতপূণ্য (পুণ্যহীন) আমি কিরূপ সমর্থ হব? অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যে শক্তিতত্ত্বের আংশিক মাহাত্ম্য অবগত হয়ে তোমার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হচ্ছেন, তোমার সেই স্বরূপ শক্তিতত্ত্ব তুমি স্বয়ং প্রকাশ করে না দিলে কার সাধ্য তা অবগত হতে পারে? জন্ম জন্মান্তরের সাধন জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত না থাকলে সে তত্ত্ব উদঘাটিত হয় না। তাই জীব তোমার কোলে থেকেও (মা দুর্গা ভবানী) তোমাকে চিনতে পারে না। মা আমার আজ এই দশা। কৃত অপরাধ ভয়ে তোমার স্তব করতে তোমাকে প্রণাম করতে কিছুতেই আর সাহস হয় না।

শ্রীশঙ্করাচার্য আরও বলেছেন অন্যত্র — "তথা মে সৌন্দর্য্য — পরমশিব ছন্মাত্র বিষয়ঃ। তোমার যে সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের দর্শনমাত্র — গোচর জীবের তা দর্শন করতে অধিকার কোথায়? মায়াবাদী বৈদান্তিকেরা দর্শনের যুক্তিজাল বিস্তার করে মহামায়ার (মহতী মায়া ঘস্যা সা মহামায়া) সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব কীভাবে উপলব্ধি করবেন?

মহামায়ার মহাশক্তিতে আবদ্ধ জীব একমাত্র তাঁর অহেতুক কৃপায় সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে।

কাশীধামে মণিকর্ণিকায় শ্রীশঙ্করাচার্য অলৌকিকভাবে মা দুর্গা, মহাকালীকে প্রথমে বালিকা বেশে ও পরে মহাজ্যোতিঃ স্বরূপা রূপে দর্শন করে স্তবলহরী লেখেন অন্নপূর্ণা মায়ের মন্দিরেও কীর্তন করেন। বেদে তন্ত্রের ন্যায় দেব-দেবীর অভেদ কল্পনাদৃষ্ট। বেদে দ্যাবা পৃথিবীকে পিতা ও মাতা রূপে ভাবনা হয়েছে। শিবপুরাণ বলছেন — "আকাশং লিঙ্গমিত্যাহু পৃথিবীস্তস্য পীঠিকা।" আকাশ লিঙ্গস্বরূপ, পৃথিবী যোনিরূপা।

শারদা তিলক তন্ত্র বলছেন — বিন্দু বিসর্গের সংযোগে শিব শক্তির দ্বৈতরূপ প্রতিষ্ঠিত এবং তার মিলিত অবস্থায় অর্ধনারীশ্বর রূপের উদ্ভব।

শৈবরা শিব শক্তির ভেদ স্বীকার করেন না। শিব শক্তি রহিত নন, শক্তিও শিবহীনা নন। শিব দৈবতাবাদীদের মতে শক্তিই শিবকে জানাবার উপায়।

গন্ধর্ব তন্ত্র মতে 'চেতনাচেতন' জগৎ শিবশক্তিময়। মহাভারতে শিব ও কালীর উল্লেখ। সেখানে শিবকে 'রক্ত মালাম্বরধর', পক্কান্ন মাংস লুব্ধ দশবাহু, কখনো অষ্টাদশভূজ বলা হয়। এসব বিশেষণ দেবী কালিকা ও দুর্গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শিব ব্রহ্মচারী, দেবী ব্রহ্মচারিণী। শিব অসুরঘ্ন, মহিষঘ্ন, দেবী অসুরনাশিনী মহিষমর্দ্দিনী। শিব শ্মশানবাসী ও দেবী শ্মশানবাসিনীও। ঋগ্বেদে যজ্ঞবেদী যোনি। রুদ্রের নাম হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত। তান্ত্রিক হোমের পূর্বে ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান করা হয় তাতে আছে —

'বাগীশ্বরেন সংযুক্ত, ক্রীড়া-ভাবসমন্বিতাম।' সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি মূলাধারবাসিনী কুন্ডলিনী শক্তির অঙ্গ বিভূতি ছাড়া অন্য কিছুনয়। আদিবর্ণ অ হতে অন্তধর্ণ 'ক্ষ' পর্যন্ত ৫০টি বর্ণ হতে উদ্ভব নয় কোটি মন্ত্র। অ থেকে স্ক পর্যন্ত মাতৃকাশক্তি বর্ণনা।

দেব-দেবীর শরীর বীজমন্ত্র হতে সমুদ্ভব।

যাঁর মনন হতে বিশ্ব বিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মসত্ত্বা এবং ব্রহ্মাণ্ডসত্ত্বা পৃথক কিছু নয় — এই অনুভূতি আসে।

মন্ত্র শব্দের উদ্ভব মম হতে। তারপর 'মম'এবং 'এ'-এর সমষ্টিতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গের ফল লাভ হয়।

মহামায়া দুর্গা এবং কালিকা'র আরাধনা ও উপাসনা দু'ভাবেও চতুবর্গ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হয়।

'শিবশক্তি' বলতে প্রজ্ঞা এবং 'জড়শক্তি'র মিলন বোঝায়।

শৈবাচার বলতে বোঝায় জীবের লক্ষ্য শিব সমাধি প্রজ্ঞা সমাধি বা আত্মায় সমাধি।

কালিকাপুরাণে শিব অর্ধনারীশ্বর। দার্শনিক তাৎপর্য কায়া ও ছায়ার মতো শিব শিবানী, বা হরগৌরী এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা। যিনি শিব তিনিই শিবানী — শুধু ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

কালীর ধ্যান — "মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম" দশ মহাবিদ্যার অন্যতম মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তার ধ্যান — দেবীর পাদপীঠে রতিকাম বিপরীত রতিতে মগ্ন — এই রূপ শিবশক্তির জাগতিক প্রকাশ। তান্ত্রিক চিন্তায় কাম অর্থাৎ সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা জীব-জগতের পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতপক্ষে একই সত্ত্বা যেমন একরূপে শিব

(এরপর ১৫ পাতায়)

ভাইফোঁটায় মেয়েদের বিশেষ ভূমিকা ভাইদের মঙ্গল কামনায়

ইন্দিরা রায়

শারদোৎসবে বাঙালীর অন্যতম আন্তরিক ভালবাসা মিশ্রিত যে অনুষ্ঠান তা হল ভাইফোঁটা। ভাইদের কল্যাণ কামনায় পরিবারের মহিলারা ভাই-এর কপালে ফোঁটা প্রদান করে, তার সঙ্গে আশীর্বাদ করে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এরপর উপহার দেওয়াটা যার যা সাধ্যমত। চিরাচরিত সময়কাল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। যে পরিবারে সন্তানদের মধ্যে পুত্র নেই বা যে পরিবারে কন্যা নেই, সেক্ষেত্রে আত্মীয়-সম্পর্কের বোন বা ভাইকে ফোঁটা দেওয়া হয়ে থাকে।

এই প্রথা এতই মঙ্গলকর যে দূর-দূরান্ত থেকেও ভাইরা, ছোট-বড়-বৃদ্ধ সকলেই বোন বা দিদিদের কাছে চলে আসার চেষ্টা করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বোনেরাও ভাইদের কাছে পৌঁছে যান। পারিবারিক বন্ধনের এই যে সুন্দর অনুষ্ঠান, তা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে। আন্তরিকতাপূর্ণ ভালবাসায় এখন ভাটা পড়ছে। এখনকার ভাই-বোনের মধ্যে ছোটবেলার সরল-সহজ মিষ্টি সম্পর্ক ক্রমশই ফিকে হয়ে

আসে, বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। এখন প্রত্যেকেই কেরিয়ারিস্ট হয়ে পড়ছে। যার জন্য একমাত্র লক্ষ্য সেদিকেই। আগেকার যৌথ পরিবারগুলিতে একসঙ্গে থাকার ফলে ভাইফোঁটা উৎসব এক অন্যমাত্রা পেত। শঙ্খ-উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে পবিত্রভাব বজায় রেখে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে যেত। কিন্তু আজ আর যৌথ পরিবার নেই। নিউক্লিয়ার পরিবারে বেশিরভাগই একটি সন্তান। তার ওপর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও কমে যাচ্ছে। তার জন্যই এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বা আনন্দ সেইভাবে অনুভূত হয় না।

বনেদি বাড়ির প্রবীণা গৃহবধূ সান্ত্বনাময়ী দেবী স্মৃতি রোমন্থনে বলে চললেন তাঁর সময়ের ভাইফোঁটার কথা। সেসব দিন কী ভোলা যায়! কত বড় সংসার ছিল আমাদের। বাবা-জ্যাঠা-কাকা সব একসঙ্গে থাকতাম। ফলে ছোট থেকেই ভাই বোনেরা সব একসঙ্গে বড় হয়েছি। কে নিজের আর কে পর — এসব জানতাম না। ছোটবেলায় বিয়ের আগে ভাইফোঁটার আগের দিন ভাইদের জন্য মিষ্টি কেনা, উপহার কেনার ধুম পড়ে যেত। তখন তো আর বাড়ি থেকে একলা বেরনোর রেওয়াজ ছিল না। ফলেই, বাবা বা কাকা

আমারে বোনেদের গাড়ি করে নিউ মার্কেটে নিয়ে যেত। দেখে-শুনে নিজেদের জমানো টাকা দিয়ে উপহার কিনতাম। সারারাত ঘুম হত না। সে যে কী মজা — বলে বোঝাতে পারব না। ভোর হতে না হতে উঠে পড়ে স্নান সেরে নতুন কাপড় পরে সবাই লেগে যেতাম যোগাড়ের কাজে। কেউ চন্দন ঘষা, কেউ বা থালা গোছানো, কেউ প্রদীপ, ফুল সাজানোর কাজ করতাম। এরপর ভাই-দাদাদের ঘুম থেকে ঠেলা দিয়ে ডেকে তুলতাম। তারপর স্নান সেরে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে যে যার আসনে বসত। বড় থেকে ছোট হিসেবে লাইন দিয়ে ভাইফোঁটার পর্ব শুরু হত। তারপর দুপুরবেলা হৈ হৈ করে জমাটি খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে দল বেঁধে বেড়াতে যেতাম। বিয়ের পরও বজায় ছিল প্রায় একইভাবে। বাপের বাড়ি চলে আসতাম। কিন্তু দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গেই যেন কেমন সব হয়ে গেল। আজ কেউ কেউ আছে, বেশিরভাগই নেই। এখনকার ছেলে-মেয়ের মধ্যে সেই নির্ভেজাল আনন্দ নেই। তাই শুধু স্মরণে মননে দিন কাটাই।

বর্তমান প্রজন্মের কিশোরোত্তীর্ণ পামেলা ভাই ফোঁটার আনন্দের স্বাদ কেমন তা জানে না। ও তো বিদেশে থাকে। একমাত্র সন্তান। বাড়িতেও কখনও দেখেনি। ফলেই বুঝবেই বা কী করে। যাদবপুরের প্রবীণ রমেনবাবু অশক্ত শরীরে আজও ভোরবেলা ট্রেনে করে রানাঘাট যান দিদির হাতের ফোঁটা নিতে। দিদির আশীর্বাদ যতদিন পাওয়া যায় এই দিনটিতে। দীর্ঘ বছরে কোনওদিনই বন্ধ হয়নি। দিদি-ভাই-এর এই মধুর আন্তরিক ভালবাসার বিনিময় সত্যিই আজকের ছেলে-মেয়ের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

ইদানীংকালে বেশ কিছু বেসরকারি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে গণ - ভাইফোঁটার আয়োজন করায় ভাইহারা বোনহারারা নতুন আলোয় উদীপ্ত হচ্ছে। এছাড়া এই গণফোঁটায় ছোটরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জ্ঞান লাভ করে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তা শেখে। এই প্রসঙ্গে একটি পরিবারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা দরকার। বেলেঘাটার সামন্ত পরিবার, যেখানে প্রতিদিন প্রায় ১০০ জনের পাত পড়ে। এক সংসারে আজও সবাই একসঙ্গে বাস করেন। ব্যবসায়ী পরিবারের কর্মচারীদের নিমন্ত্রণ করা হয় ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে। বিরাট হলঘরে সবাই একসঙ্গে বসেন। সেদিন মালিক-কর্মচারীর মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না। বাড়ির মেয়েরা সবাইকে ফোঁটা দেন। দুপুরে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হয়।

এইভাবে যদি পারিবারিক অনুষ্ঠানকে সামাজিক করে তোলা যায়, তাহলে এই উৎসব আলাদা মাত্রা পাবে। মেয়েরা সকলেই খুঁজে পাবে ভাইদের, অন্যভাবে বোনেদেরও।

সংশোধনী

গত চিত্রকথা-র সংখ্যা তিন-এর বদলে চার পড়তে হবে।

— স্বঃ সঃ

।। চিত্রকথা ।। হনুমান ও ভীম ।। ৫

হায়দরাবাদে মুসলমান মেয়েরা 'হিন্দু' বিয়ে করছে

মুজফ্‌ফর হোসেন

দশ-বারো বছর আগে একটা খবর ভারতের সংবাদমাধ্যমে ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছিল। এগারো বছরের এক হায়দরাবাদী মুসলমান নাবালিকা তার ঠাকুর্দার বয়সী আরবীয় শেখকে নিকাহ্ করে তার ঘর করতে চলেছে। পরে সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সেই মেয়েটি বেঁচে যায়। শেখের হাতে তখনকার মতো হাতকড়া পড়েছিল। মেয়েটির দুর্ভাগ্য যে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও দাম ছিল না। কেননা, তার মা-বাবাই তাকে প্রভূত অর্থের বিনিময়ে আরবের ধনকুবের শেখের হাতে বেচে দিয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে যেমন সব কিছু পাল্টায় তেমন করে কিন্তু কোরাণ বা মুসলমান মানসিকতা পাল্টায়নি। তবে যে পিলে চমকানো খবর পাওয়া গেছে তা হল — মেয়েদের মনোভাব পাল্টাচ্ছে। তারা এখন হিন্দু যুবকদের বিয়ে করতে চাইছে। কাল আর আজ এর মধ্যে এই তফাৎ। অবশ্য সানিয়া মির্জাদের স্কার্ট পরা নিয়ে মোল্লা-মৌলবীরা ফতোয়া দেওয়া বন্ধ করছেন না।

খবরটা বের হয়েছিল গত জুন মাসে। হায়দরাবাদের তেলেগু, ইংরেজী অথবা হিন্দী দৈনিকসংবাদপত্রই নয় উর্দু দৈনিকেও ফলাও করে খবরটা বের হয়েছিল। হায়দরাবাদের উর্দু দৈনিক লিখছে — এটা কোনও সিনেমার ঘটনা নয় বাস্তব তথ্য এবং সত্য ঘটনা। হায়দরাবাদ এবং সিকন্দরাবাদের বিবাহ নথিভুক্তকরণ অফিসে এই তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে। উর্দু সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী — যে সকল মুসলমান মেয়েরা ঘরের বাইরে পা রাখত না, মা-বাবার অনুমতি ছাড়া কোনও কিছুই স্বেচ্ছায় করত না, তারাই আজ শুধু ঘরের বাইরে পা বাড়াচ্ছে না; উপরন্তু ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে গিয়ে মনের মানুষকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করছে। মেয়েকে যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে বাড়ির লোক হৈ চৈ করছে তখন কেউ পরামর্শ দিয়েছিল — ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন। ওখানে যেতে গার্জেনদের বাইরের নোটিশ বোর্ড দেখতে বলা হয়। নোটিশ বোর্ডের নোটিশ দেখে তো অভিভাবকদের পায়ের তলার মাটি সরার জোগাড়। মেয়ে হিন্দু-বরকে বিয়ে করেছে, নাম বদলেছে এবং যুগপৎ স্বেচ্ছায় ইসলাম পরিত্যাগ করার ঘোষণা করে বসে আছে। এ যেন এক অকল্পনীয় অদ্ভুতুড়ে কান্ড অজান্তেই ঘটে গেছে। সমাজে গিয়ে খবরটা চাউর হতেই তো সবার মাথায় হাত। এ তো বিপরীতমুখী স্রোত বইছে। উর্দু খবর কাগজ আরও লিখেছে 'আমরা ওই মুসলমান (প্রাক্তন) মেয়েদের আগের নাম বলতে চাই না। তবে মুসলমান মেয়ের অভিভাবকদের সাবধান করে দিতে চাই।' ওই প্রেমিক যুগল রেজিস্ট্রি বিয়ে করেই ক্ষান্ত হয়নি ওরা হিন্দু রীতি-নীতি অনুসারে জীবন যাপনও শুরু করে দিয়েছে। মেয়েটি নিজের বিশ্বাসমতো ইসলাম ছেড়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। হায়দরাবাদে একটি হিন্দু সংগঠন রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে সামিয়ানা প্যান্ডেল খাটিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে। সবকিছু হয়েছে হিন্দু রীতিনীতি অনুসরণ করেই।

> **"বাস্তব ঘটনা হল, মুসলমান মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমান ছেলেদের থেকে অনেক এগিয়ে। তাঁরা তাঁদের যোগ্য পাত্র তাদের সমাজে বেশিরভাগ সময়ে খুঁজে পান না। এজন্য তারা অবিবাহিত থাকা অথবা অন্য সমাজের সুশিক্ষিত যুবকদেরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চয়ন করেন।"**

শহরের অনেক গণ্যমান্য নাগরিকও বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এবং বরের বাড়ির আত্মীয়স্বজনরা নব পরিণীতা বর-বধূকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। যে সব নববিবাহের কথা এখানে বলা হচ্ছে তার সবই কিন্তু হায়দরাবাদ এবং সিকন্দরাবাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে নথিভুক্ত রয়েছে। ওই দুটি শহরের এরকম তেরোটি বিবাহ রেজিস্ট্রি কার্যালয় আছে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যান্য শহরেও এরকম ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে। যার খবর খবরের কাগজে বের হয়নি। জাঁক জমকপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানের কথাটা জানাজানি হতেই মুসলমান সমাজের নেতা-কর্তাব্যক্তি এবং সাংবাদিক — বিশেষত উর্দু পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের হঠাৎ খোঁজ-খবর সংগ্রহে ব্যস্ত হতে দেখা গিয়েছে। তারা এখন খুঁজে বের করছেন কোন কোন মুসলমান মেয়েরা হিন্দু-যুবকদের বিয়ে করতে মনস্থ করেছে। যেটুকু খবর বের হয়েছে তা শুধুমাত্র দুটো শহরের এবং জুন মাসের (২০০৯)। এর আগের মাসের, বছরের এবং অন্যান্য শহরের ঘটনা যোগ করলে সংখ্যাটা যে অনেক বাড়বে — তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুসলমান পরিবারের অনেক সোমত্ত মেয়েদের পাওয়া যাচ্ছে না বা হারিয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হয়। তাদের একটা বড় অংশই হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করে জীবনযাপন করছে ধরে নিলে খুব একটা ভুল হবে না। ওই সব বাড়ির গার্জেনদের অন্যান্য শহরে ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিসে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।

হায়দরাবাদ, সিকন্দরাবাদ-এর এই কয়েকটি বিয়ের ঘটনায় এক নতুন যুগের নব অধ্যায়ের শুভারম্ভ হয়েছে বলা যেতেই পারে। একটা বাস্তব ঘটনা হল, মুসলমান মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমান ছেলেদের থেকে অনেক এগিয়ে। তাঁরা তাঁদের যোগ্য পাত্র তাদের সমাজে বেশিরভাগ সময়ে খুঁজে পান না। এজন্য তারা অবিবাহিত থাকা অথবা অন্য সমাজের সুশিক্ষিত যুবকদেরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। মুসলমান সমাজপতিরা (মোল্লা-মৌলবী) পর্দাপ্রথাকে দারুণ গুরুত্ব দেন। শিক্ষিত মেয়েরা এটা পছন্দ করেন না। মুম্বাই শহরে অনেক মুসলিম কলেজ-ছাত্রী বাড়ি থেকে বের হন পর্দা ঢাকা নিয়ে কিন্তু কলেজে ঢোকার আগে পর্দাটা ব্যাগে ভরে নেন। এভাবেই তাদেরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিচারিতা করতে বাধ্য হতে হয়। ধার্মিক কট্টরতা যখন ছাত্র বিশেষকে বিশেষ ধর্মীয় রীতির পোষাক পরতে বাধ্য করা হয় তখন সে সকলের সামনে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়। কেউ মুখফুটে কিছু না বললেও। নিজের স্বধর্মীয় বিদ্যার্থী যখন কোনও শিক্ষিত মুসলমান ছাত্রীকে প্রভাবিত করতে পারে না তখন সে স্বাভাবিকভাবেই অন্য ধর্মের প্রভাবশালী, মার্জিত ও বিদ্বান ছাত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। এজন্যই কাউকেই কোনও ধর্মীয় কট্টর বেশ-ভুষা দিয়ে আটকে রাখা যায় না। আর তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়া স্বাভাবিক। পরিণাম ভালো হয় না।

অসমে খনিজ তেলের গন্ধে চীন মদত যোগাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদকে

শ্যামাপ্রসাদ দাস।। অসম এবং তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে বহুদিন ধরেই বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থী আন্দোলনে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। এই আন্দোলনকে প্রথমে বলা হতো বঙ্গাল খেদা আন্দোলন। অসমিয়া ভাষায় বঙ্গাল শব্দের অর্থ বিদেশী। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নেপাল এবং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যেসব লোক এসে অসমে বসতি স্থাপন করে বসেছে তাদের উচ্ছেদ করাই ছিল আন্দোলনকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলো আন্দোলনের গতি প্রকৃতি কিছুটা বদলে দেয়। তারপর হিন্দুদের বলা হতো শরণার্থী আর মুসলমানদের বলা হতো অনুপ্রবেশকারী। ধীরে ধীরে আবার সেই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বদলে যায়। পূর্ব-পাকিস্তান রূপান্তরিত হলো বাংলাদেশে। তার কয়েক বৎসর পরে স্বাধীন অসম, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়।

তবে তার আগেও বঙ্গাল খেদা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একান্তে বসে কথা প্রসঙ্গে তাদের মুখে শুনেছি তারা স্বাধীন অসম চায়। তাদের আছে খনিজ তেলের ভাণ্ডার। চীন তাদের এই আন্দোলনের সহায়ক। যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সেদেশের আন্দোলনকারীদের সহায়ক হয়েছিল ভারত। তেমনি চীন রয়েছে তাদের পাশে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গাল শব্দটিকে পরোক্ষে ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও তারা ব্যবহার করতো। নিজেদের মধ্যে কথা প্রসঙ্গে তারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোককে বলতো বঙ্গাল।

সম্প্রতি হাটে-হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে কমিউনিস্ট চীনের সরকারি গবেষণা সংস্থার চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ। তারা তাদের একটি ওয়েবসাইট জার্নালে ভারতকে ২০ থেকে ৩০ ভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে ডাক দিয়েছে। ওয়েবসাইটে আরও বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ যদি ভারত থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলা গড়ে তুলতে চায়, তাহলে চীন সব রকম সহযোগিতা করবে? তাছাড়া চীন অসমের উলফা জঙ্গি গোষ্ঠীকে স্বাধীন অসম রাষ্ট্র গঠনের জন্য সব রকম সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশের মাধ্যমে তারা অরুণাচল প্রদেশের ৯০ হাজার বর্গ কিমি ভূখণ্ড দখল করার জন্যও সবরকম প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

অসমের তেলের গন্ধে উন্মাদ চীন স্বাধীন মণিপুর-নাগাল্যান্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, তারা মণিপুরের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের চীনের বিশেষজ্ঞরা মায়ানমারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। প্রশিক্ষণের পরে প্রত্যেকের হাতে প্রশিক্ষকরা অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রকাশ মণিপুরের জঙ্গি সংগঠন পিপুলস্ লিবারেশন আর্মির ৪০০ সদস্যকে চীনা প্রশাসন তাদের ইউনান প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিল বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য। সম্প্রতি চীন প্রতিষ্ঠিত মণিপুরের কতিপয় জঙ্গি সংগঠনের ১৬ প্লাটুন সৈন্য গড়ে তোলার জন্য তারা প্রশিক্ষণের জন্য মায়ানমারের পথে চীনে পাঠিয়েছে। ভারত সরকারের শান্তিপ্রিয় দুর্বল মানসিকতার সুযোগ নিয়ে ঐসব চীনা সংগঠনগুলো অসম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনকী মণিপুরের নব-নির্মিত এসেমব্লি হাউস এবং হাইকোর্টের নির্মাণ কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শুধু নির্মাণ সংস্থার কাছে ওইসব সংগঠনগুলোর টাকার চাহিদা পূরণ না করার জন্য। এছাড়াও মাস দুই আগে অন্য আর একটি নির্মাণ কাজে সন্ত্রাসবাদীদের চাহিদা মেটাতে না পারায় চারজন সাধারণ শ্রমিক গুলিতে প্রাণ হারায়। ঘটে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। তারপরই শুরু হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভিযান কারফিউ। এর সঙ্গে চলছে এখন কমিউনিস্ট কায়দায় বন্ধ অবরোধ মিছিল পথসভা। বন্ধ রয়েছে হাইকোর্ট এবং এসেমব্লি হাউসের নির্মাণ কাজ। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এইসব গণ আন্দোলনের নাটকের অগ্রভাগে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ঠেলে দিচ্ছে মহিলাদের। যার ফলে পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনীকে অত্যন্ত সংযতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

ভারত সরকারের দীর্ঘ টালবাহানার মনোভাবের ফলে নাগাল্যান্ডের চীনা জঙ্গি সংগঠন এন এস সি এন গেরিলাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী এবং আধা সেনাবাহিনীর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেরী হয়ে যায়। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য হাতের ইসারায় যখন সেনাবাহিনী জঙ্গীদের কোণঠাসা করে ফেলে তখনই শুরু হয় অস্ত্র বিরতির নাটক। এই সাফল্যের জন্য জঙ্গি সংগঠনের চেয়ারম্যান আইজাক চি স্যু-কে চীন আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ। এই অস্ত্র বিরতির সুযোগ নিয়ে নাগা এবং মণিপুরি জঙ্গিরা চীনের কাছ থেকে উন্নত মেশিনগান এবং যোগাযোগের উন্নত প্রযুক্তির মেশিনপত্র পেয়েছে। এ সবই আসছে আকসাই চীনের পদানত মায়ানমারের পথ ধরে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ ক্ষমতা দখলের পরে সেখান থেকে চীনা তাঁবেদারি বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় যেসব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল তা দুর্বল হয়ে পরেছে। তাই এন এল এফ টি, এ টি টি এফ, বি এন সি টি উলফা এবং আসল সংগঠনগুলোর ঘাঁটির কিছু অংশ মায়ানমারে স্থানান্তরিত হচ্ছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে প্রকাশ। শুধু তাই নয়, এরপরে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড়, ওড়িশাতে ও চীনা মদতপুষ্ট মাওবাদী সংগঠনগুলোর

(এরপর ১৪ পাতায়)

খেলার জগৎ

লিয়েণ্ডার-শচীন কি জীবন্ত বাস্তব?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। চোখের সামনে একের পর এক কল্পকাহিনী লিখে চলেছেন দুই ওভার থার্টি। যে বয়সে ক্রীড়াবিদরা তাদের সাজ-সরঞ্জাম তুলে রেখে পরিবারের সঙ্গে আলসেমি করে কাটায়, সেই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে নতুন নতুন কীর্তিকল্প রচনা করে চলেছেন লিয়েন্ডার পেজ, শচীন তেন্ডুলকার। এদের সঙ্গে আরও একজনের নাম বলতে হবে — মহেশ ভূপতি। তারও তো নয় নয় করে ৩৫ বছর বয়স হল। সমান তালে গ্রান্ড স্লাম টেনিসে ফাইনাল খেলে চলেছেন লি'র মতন। রাহুল দ্রাবিড়কে এই ব্র্যাকেটে রাখা যাচ্ছে না কারণ গত দু'বছর তিনি তাঁর ফর্মের ধারাবাহিকতা রাখতে ব্যর্থ।

লিয়েন্ডার, শচীনের এই সাফল্যের রসায়ন কি? ক্রীড়া বিজ্ঞানীরা বলবেন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ এখনও সঠিক নিশানা ও কার্যক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছে। ক্রীড়া গবেষকরা বলবেন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও নতুন কোনও ল্যান্ডমার্ককে টার্গেট করে তা ছোঁয়ার অদম্য সংকল্প। আর মিডিয়া আছে। তাদের সমালোচনাই এদের মধ্যে এখনো নিজেকে সফল দেখতে চাওয়ার খিদেটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে। নানা জনের নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য হলো এরা জীবনের প্রতিপাদ্য মর্ম গুরুত্ব অনেক আগেই উপলব্ধি করেছে। নিজেকে জীবনের চেয়ে বড় করে তোলা আর ভাবী প্রজন্মকে এক জীবনাদর্শ দেওয়া।

আখতার আলি তার নিজের কলামে লিখেছেন মহেশ ভূপতির সঙ্গে তীব্র ইগোর লড়াই 'লি'কে দুনিয়ার এক কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঠিকই বলেছেন। দু'জনেই যখন একই টুর্নামেন্টে বাছাই হয়ে খেলতে নামেন জুড়িদারকে নিয়ে তখন সবার অলক্ষ্যে কাজ করে এই ইগোর ব্যাপারটি। ১৯৯৬-২০০০-এই চার বছর দু'জনে একসঙ্গে ডাবলস্ খেলেছেন। ডেভিস কাপ থেকে এ টি পি সার্কিট, সর্বত্র বিরাজিত তেরঙ্গার মহিমা। কোনও এক অজ্ঞাতকারণে দু'জনের মনোমালিন্য, পরিণতিতে জুটি বিচ্ছেদ। তাতে যতটা না নিজেদের ক্ষতি করলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ভুক্তভোগী ভারতবাসী। গত ৯ বছরে দু'জনে অজস্র গ্রান্ড স্লাম জিতেছেন বিদেশী জুড়ি নিয়ে। আর সেই সাফল্য গরিমার আধাআধি ভাগ পেয়েছে ভারতবর্ষ। নিজেরা জুটিতে খেলে এইসব সাফল্য আনলে তা হোত নির্ভেজাল দেশীয় কীর্তি। একমাত্র অলিম্পিক ও ডেভিস কাপেই দু'জনে একসঙ্গে খেলেন। উপায় নেই বলেই খেলতে বাধ্য হন। দু'জনের ব্যাকালাপ পর্যন্ত নেই। অথচ ২/৩ দিনের অনুশীলনেই কোর্টে নেমে অনায়াসে বিপক্ষ জুটিকে বধ করেন। যদিও অলিম্পিক পদক করায়ত্ত হয়নি। কিন্তু ডেভিস কাপে পরের পর ডাবলস্ জিতে চলেন। এক সময়ে দু'জনে কোর্ট ও কোর্টের বাইরে হরিহর আত্মা ছিলেন। দু'জনে দু'জনের মনস্তত্ত্ব ও খেলার প্রকরণ খুব ভাল জানেন, তাই নামমাত্র অনুশীলনেই কেল্লা-ফতে করে দেন। তাহলে যদি একসঙ্গে খেলতেন? হয়তো বিশ্ব টেনিসের মহাকাব্যিক ডাবলস জুটির স্বীকৃতি পেতেন। ম্লান হয়ে যেতেন জন নিউকোম্ব-কেন রোজওয়াল, জন ম্যাকেনরো-পিটার ফ্লেমিংয়ের মতো চিরস্মরণীয় জুটি।

অন্যদিকে শচীন তেন্ডুলকর তারুণ্যের জয়গানের মধ্যেও নিজের ঐক্যতান বাজিয়ে চলেছেন। অধিনায়ক ধোনির ইচ্ছা থাকলেও

লিয়েণ্ডার

শচীন

তাকে ওয়ানডে স্কোয়াড থেকে ছেঁটে ফেলতে পারছেন না। টি-টোয়েন্টি থেকে বাদ দিলেও ৫০-৫০ ম্যাচে শচীন যে এখনও অপরিহার্য — এই ব্যাপারটা যতই অপছন্দের হোক মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন অধিনায়ক। আর শচীনও যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন। ২০১১ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলবেন। জিনিয়াসরা যা প্রতিজ্ঞা করেন তা ঘটিয়েই ছাড়েন। যতই বয়স বাড়ুক, শারীরিক দক্ষতা ও ক্রীড়ায়ত্ত প্রতিভায় টান পড়তে দেন না। অলক্ষ্য থেকে যে ভগবানও তাই চান। তাই রাহুলকে নিয়ে দড়ি টানাটানি চলতে পারে, শচীনকে এরকম ক্রীড়নক বানাবার কোনও সাহস বা ক্ষমতাই নেই টিম ম্যানেজমেন্টের।

কুড়ি বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একইরকম আবেগ, উদ্দীপনা বজায় রেখে পারফর্ম করে চলা দূরতম কল্পনাতেও ভাবা সম্ভব নয়। টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে কত পালাবদল ঘটে গেছে। চরিত্র ও আঙ্গিক দু'ক্ষেত্রেই বিবর্তনের সঙ্গে মাননসই হয়ে নিজের কাজটি করে যাচ্ছেন শচীন। প্রথম যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এলেন, তার সম্পর্কে বলা হয়েছিল 'বিস্ময় বালক'। এখনও সেই রহস্যময় 'বিস্ময় শচীন'। এই বয়সেও যৌবনের তেজ ও ক্ষিপ্রতা নিয়ে যখন সিঙ্গলস কুড়িয়ে নেন, কিংবা 'স্টেপ আউট' করে 'লিফট' করেন তখন মনে হয় এই রিফ্লেক্স, এই ব্যাটসম্যানশিপ কোনও জাদু বলে ধরে রাখতে পেরেছেন। তাই তার অনায়াস সাচ্ছন্দ ব্যাটিংশৈলী দেখে মনে হয় একি মায়াবি ড্রিম না অতিমাত্রিক বাস্তব।

তবে কতিপয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ও মিডিয়াকুল তাকে যেভাবে ডন ব্রাডম্যানের সঙ্গে তুলনায় এনে ফেলেন কথায় কথায়, তা মেনে নেওয়া যায় না। আর ব্রাডম্যানও ক্রিকেটের শেষ কথা নয়। পারফরমেন্স যতই উত্তুঙ্গ হোক। ব্যাটসম্যানশিপের সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্যের নিরীখে ইংল্যান্ডের স্যার জ্যাক হবস-ই সর্বোত্তম। সব রকম উইকেটে সব ধরনের বোলারকে সব ভঙ্গিমায় খেলে রান করে গিয়েছেন। ব্রাডম্যান ভিজে উইকেটে তার ক্ষমতা অনুযায়ী চরমতম উৎকর্ষতা মেলে ধরতে পারেননি। যদিও সাধারণ বা ভাল মানের ব্যাটসম্যানের তুলনায় অধিকতার সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু ব্রাডম্যান মানেই 'একশো-দুশোর ইনিংস' তা সব সময় ভিজে উইকেটে খেলতে পারেননি। অন্যদিকে হবস 'ফাস্ট বাউন্সি উইকেট', ভিজে উইকেট, 'স্লো-টার্নার' কিংবা 'আন্ডার প্রিপেয়ার্ড' উইকেট সর্বত্র রান করে গেছেন। তাই ক্রিকেটের বাইবেল উইসডেন হবসকে এক ইঞ্চি হলেও ব্রাডম্যানের ওপরে রাখে।

হবস, ব্রান্ডম্যান ছাড়াও গ্রেটেস্টদের তালিকায় গ্যারি সোবার্স, এভার্টন উইকস, নীল হার্ভে, ভিভ-রিচার্ডস, গ্রেম পোলকরা শচীনের চেয়ে এগিয়ে থাকতেন। অ্যাভারেজ ও সমকালীন মানদন্ডের প্রেক্ষিতে এই তুলনা টানা অর্থহীন। যদিও ক্রিকেটে এখন অ্যাথলেটিক ক্ষমতা অনেক বেশি প্রযোজ্য কিন্তু উইকেটের চরিত্র ও বোলারদের মান আগের মতো নেই। আগে উইকেট ঢাকা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সবুজ উইকেট হোত ভারত, পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশের টেস্ট প্লেয়িং সব সেন্টারে। পেস ও স্পিন দু-ধরনের বোলিং মান অন্তত এখনকার মানের তুলনায় কিছুটা হলেও উন্নত ছিল। তাই সোবার্সরা যে ধরনের উইকেটে যে মাপের বোলারদের খেলে টানা কুড়িবছর একইরকম ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন, তা অবশ্যই সমকালীন গ্রেট ব্রায়ান লারা বা তেন্ডুলকারের কাছেও দৃষ্টান্ত।

শব্দরূপ - ৫২২

কোয়েল মজুমদার

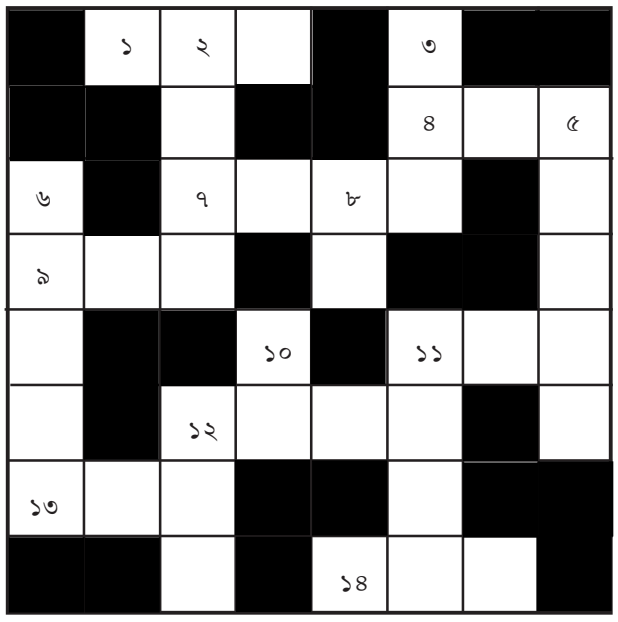

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. জলের কঠিন অবস্থা, ঘনীভূত, ৪. ঝালস্বাদযুক্ত মশলাবিশেষ, ৭. অব্যয়ে অস্পষ্ট ঈষৎ জ্বালা, ৯. খড়্গ, খাঁড়া, মধ্যে ঘৃত, ১১. ময়ূর পুচ্ছ, ১২. বারংবার, পুনঃপুন, ১৩. মোটা লাঠি, ডান্ডা, কোঁতকা, ১৪. ধরা সমার্থে পৃথিবী।

উপর-নীচ ঃ ২. ইঙ্গ শব্দে ম্যাপ, ৩. আদালতে হাজির হওয়ার হুকুমনামা, পরোয়ানা, শেষ দুয়ে হৃদয়, ৫. পাদকমল, ৬. বালক শ্রীকৃষ্ণ, ৮. "মম নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে" — গান, ১০. সরষের মধ্যে রাধা, ১১. আরবি শব্দে সম্রাট, বাদশাহ, ১২. প্রতিবেশী, ১৩. 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের এক ব্যারিস্টার, ১৫. পুষ্পরস।

সমাধান শব্দরূপ ৫২০

■	আ	য়া	ন	■	প্র	■	অ
■	য়ু	■	ট	■	মা	ল	ঞ্চ
হি	■	■	রা	ব	ণ	■	লি
র	ক্ত	বী	জ	■	■	■	ক
ণ্য	■	■	■	র	ক্ত	জ	বা
ক	■	আ	র	তি	■	■	ণ
শি	ক	ল	■	প	■	ব	■
পু	■	তা	■	তি	ল	ক	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
সত্যেন মন্ডল
নলহাটী, বীরভূম।

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫২১ সংখ্যার ও ৫২২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ অক্টোবর ২০০৯ সংখ্যায়

চীন মদত যোগাচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদকে

(১৩ পাতার পর)

তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিদায় নিচ্ছে তখন তাদের ভারতপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় বিমান থেকে পুরুলিয়ায় অস্ত্র নিক্ষেপের মাধ্যমে। তারপরই সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ে ভারতে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। এখন চীন সম্বন্ধেও ভারতবাসীর চিন্তা ভাবনার সময় এসেছে। কারণ চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, চীন তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। তাই তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপে ভারতবাসীর মনে নানারকম চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। যেমন এখন চীন ভারত বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে চীন থেকে যেসব মেশিন পত্র এবং অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আসছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। এইসব শিল্প সামগ্রী সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কোম্পানীর যেসব প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হয়ে চীনে যায় তাদের মন জয় করতে তারা নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে। সস্তায় ওইসব জিনিসপত্র ভারতীয় শিল্প ধ্বংসের এক একটি অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কথা এখন চীন থেকে ঘুরে আসা সচেতন প্রতিনিধিদের মুখেই শোনা যায়। সম্প্রতি বঙ্গাইগাঁও, গুয়াহাটি, ডিগবয় এবং ডিব্রুগড় রিফাইনারীর সম্প্রসারণের কাজ চলছে। সেখানেও ঢুকে পড়ছে চীনা মেশিন পত্র। যেমন ডিব্রুগড়ে তেলকূপ খননের কাজ চলছে একটি চীনা অয়েল রিগ এবং আনুসঙ্গিক মেশিন পত্র দিয়ে। তার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশিক্ষণে আছে চীন দেশের লোক। তারা সহজেই জানতে পারছে এই অঞ্চলের খনিজ তেলের অবস্থান। এখন নানাভাবেই অসমের তেলের গন্ধ চীনকে আরও উন্মাদ করে তুলবে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছে। আকসাই চীনের নজর অসম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে থাকার আর একটি কারণ হলো এইসব অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠন প্রণালী এবং কথোপকথনের উচ্চারণ ভঙ্গিমা ও শব্দমালার সঙ্গে চীনের নাগরিকদের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। তাছাড়া চীন যদি এসব অঞ্চলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে পারে তাহলে তাদের চীনের সঙ্গে মেলবন্ধন সহজ হবে। তারপর তেলকূপগুলো যাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে। এই ডামাডোলের বাজারে শিল্পকে আর একটি ভারত বিরোধী শক্তি ও পূর্ব ভারতকে চীনের সহযোগিতায় কব্জা করার স্বপ্ন দেখছে।

আমরা সেই ১৯৫০-শের দশক থেকেই দেখে আসছি অসম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোতে সমান্তরালে চলছে দুটো শাসন ব্যবস্থা। মুসলমানরা তাদের শরিয়তি আইন-কানুনের উপরেই নির্ভরশীল। গ্রামগঞ্জে চলছে এখনও সেই কাজির বিচার। মসজিদের ইমামই তাদের প্রশাসনের সর্বোচ্চ আসনে। ভারতীয় আইন আদালতের দ্বারস্থ তারা কিছুতেই হতে চায় না। যদি না কোনও বিশেষ ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ে। চীনা কমিউনিস্ট উপনিবেশ গড়ার ডামাডোলের বাজারে, মুসলিমরা সিঁদ কেটে যেভাবে ঘরে চোর ঢোকে, সেভাবেই অসমে এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ২৯টি জেহাদি সংগঠনের মাধ্যমে পূর্ব ভারতে বাংলাদেশকে নিয়ে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করার জন্য এগিয়ে চলছে। চীনের গবেষণা সংস্থা গোপন সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেই তা নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে আমরা পঞ্চশিলায় হিন্দি চীনি ভাই ভাই ডামাডোলের বাজার দেখেছি। দেখেছি জওহরলাল নেহেরুর চীন ভারত মৈত্রীর বাহারি আড়ম্বর। সেই সুযোগ নিয়ে ভারত সীমান্তে ঢুকে পড়ে চীন তার লাল ফৌজ নিয়ে। বন্ধুত্বের শেষ পরিণতি হয় ১৯৬২ সনের চীন ভারত যুদ্ধে। এখন আবার অটল বিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার চীন ভারত মৈত্রী চুক্তির সুযোগ নিয়ে চীনা সৈন্যের আস্ফালন শুরু হয়ে গেছে ভারতের উত্তর সীমান্তে। বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে— মানুষের স্বভাব মরলেও যায় না। চীনের আকসাই মনোভাব যে কোনওদিন যাবে না তার আমরা বহু প্রমাণ পেয়েছি।

তিববত দখলের পরে এখন তাদের নেপালে হয়েছে আংশিক সাফল্য। ভূটানেও চলছে তাদের পরোক্ষ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। অরুণাচল প্রদেশ লাদাখে যে তারা যেকোনও সময় অভিযান শুরু করবে। সেই পদক্ষেপ তারা শুরু করে দিয়েছে। যদি ভারত সরকার এবং ভারতবাসী এখনই তাদের শান্তিপূর্ণ নমনীয় মনোভাব ত্যাগ না করে, তাহলে তারা অচিরেই দু'দিক থেকেই আক্রান্ত হবে। সম্প্রসারিত হবে চীন সীমান্ত।

সিপিএমের উত্থান এবং পতনের কারণ

শিবাজী গুপ্ত

গত ১৩ জুলাইয়ের এক দৈনিক "জ্যোতিবাবুকে অন্তরঙ্গ পরিবেশে....এক সমন্বয়ী ব্যক্তিত্ব" শীর্ষক প্রতিবেদনে লেখক জ্যোতি বসু ও তাঁর দলের ক্ষমতায় আসার মুখ্য কারণের মধ্যে কয়েকটি আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেসব আন্দোলনের রেডিমেড মালমশলা কেমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের হাতে পেয়ে গেলেন সে সম্পর্কে নির্বাক রয়ে গেছেন। তার প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে হলেও একটু বলা প্রয়োজন।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বিধবস্ত বাংলা স্বস্তির নিঃশ্বাস না ফেলতেই বৃটিশ সরকার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচন ডেকে দিল। প্রধান দুটি দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। কংগ্রেসের দাবী স্বাধীনতা, লীগের দাবী দেশভাগ ও পাকিস্তান। কম্যুনিস্টরা মুসলিম লীগের দেশভাগ ও পাকিস্তান দাবীর সোচ্চার সমর্থক।

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিম ভোটে কংগ্রেস ও লীগের জয়জয়কার। সিপিএমের পূর্ব-পুরুষ সিপিআই প্রার্থী হিসাবে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হন — তারা হলেন জ্যোতি বসু, কমলকৃষ্ণ রায় ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে যখন দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠল এবং সম্পূর্ণ বাংলা পাকিস্তানে যাবার পথে, তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বাংলার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ কে পাকিস্তানের গ্রাস থেকে রক্ষা করেন। জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ হলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য, আর কমলকৃষ্ণ রায় হলেন পূর্ববঙ্গ বিধানসভার সদস্য। ১৯৪৭-এর সেই দুইজন থেকেই জ্যোতিবাবুর দল সিপিআই'র নব সংস্করণ সিপিএম ২০০৭ সালে ২৩০টি আসল দখল করে। যাক, সে তো অনেক পরের কথা।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট অখণ্ড ভারতের পরিবর্তে বিভক্ত ভারত ও খন্ডিত বাংলার স্বাধীনতা লাভে বাঙালী জাতি ম্রিয়মান, কিন্তু মুসলিম লীগের বৈরী শাসন থেকে মুক্তি লাভে স্বস্তি লাভ। এদিকে অন্নদাতা জেলাগুলি তো সবই চলে গেল পাকিস্তানে। চটকলগুলি সবই রইল পশ্চিমবঙ্গে;কিন্তু পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলি সব পড়ল পাকিস্তানে। মানুষের নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি প্রায় সবই পশ্চিমবঙ্গে বটে, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের বিরাট বাজার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটীর শিল্প কারখানায় দারুণ মন্দাভাব। সুতরাং অন্ন-বস্ত্রের অভাব ও আর্থিক সঙ্কটে স্বাধীনতার আনন্দোচ্ছ্বাস উবে গিয়ে মানুষের মন আশাভঙ্গজনিত হতাশা ও নৈরাশ্যে ডুবে যেতে থাকে।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও লণ্ডভণ্ড অবস্থা। মাত্র সাড়ে চার মাসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দুর্নীতি ও খেয়োখেয়িতে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদের লোভ, ক্ষমতাস্পৃহা ও দুর্নীতিদুষ্ট নগ্ন চেহারা সাধারণ্যেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এসে বেহাল শাসন ব্যবস্থার হাল ধরেন।

কম্যুনিস্টদেরও তখন বেহাল অবস্থা। যুদ্ধে বৃটিশের পক্ষ হয়ে দালালি ও গোয়েন্দাগিরি, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা, নেতাজীকে জাপানের গাধা ও তোজোর কুকর আখ্যা দান, পাকিস্তান দাবীর সমর্থন ইত্যাদি অপকর্মের দরুণ লোকসমাজে মুখে দেখান ভার। তখন জনগণের হতাশা ও নৈরাশ্যের সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্টরা "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" বলে রাস্তায় নেমে পড়ে। তাদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তারা নারী ও শিশুদের সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল-মিটিং করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে গায়ে পড়ে সংঘর্ষ বাধায়। চলে লাঠি গুলি গ্যাস। হতাহত হয় কিছু নারী পুরুষ শিশু। তখন নারীঘাতী শিশুঘাতী বিধান রায়ের সরকারের বিরুদ্ধে ডাকা হয় হরতাল (বর্তমানে বন্‌ধ)। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে অব্যাহতভাবে।

এমতাবস্থায় ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে বিধবংসী দাঙ্গার শিকার হয়ে এক দফে ৫০ লক্ষ লোক জান-প্রাণ-মান বাঁচাতে একবস্ত্রে পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির হয়। তাদের চাল নেই চুলো নেই, নেই অশন-বসন। তারা প্রকৃতই সর্বহারা — যাদের প্রতিনিধিত্ব কম্যুনিস্টরা জোর গলায় দাবী করে। শুরু হল কম্যুনিস্টদের বাস্তুহারা রাজনীতি। তারা "আমরা কারা বাস্তুহারা" স্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। আশাহীন ভরসাহীন ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা কম্যুনিস্টদের নিঃস্বার্থ দরদী জ্ঞানে তাদের পেছনে দাঁড়াল। কম্যুনিস্টরা ফলও পেল হাতে হাতে। কৃষ্ণনগর থেকে বজবজ পর্যন্ত যে রিফিউজী বেল্ট গড়ে ওঠে ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই সে অঞ্চলে কম্যুনিস্টদের জয়জয়কার। রিফিউজীরাই হল কম্যুনিস্টদের রাজনীতির মূলধন ও ভিত্তিভূমি। তার উপর ভিত্তি করেই তারা সারা পশ্চিমবঙ্গে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার কাজে নেমে পড়ে। বাস-ট্রাম পুড়িয়ে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করে।

তারা এবার কলকারখানার শ্রমিক, অফিস আদালতের কর্মচারীদের দলে টানার কাজ শুরু করে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ইনকিলাব-জিন্দাবাদ ধ্বনির সঙ্গে কতগুলি দিশি স্লোগান যুক্ত করে কলকারখানা ও অফিসপাড়া মাত্ করে তোলে। যেমন : ভেঙে দাও — গুঁড়িয়ে দাও / মানছি না-মানব না / দিতে হবে-দিতে হবে/ রুখছি রুখব / চলবে না-চলবে না / দূর হটো-দূর হটো / যায় না - যাবো না / চলছে চলবে ইত্যাদি। স্লোগায়নের মতো এই স্লোগান জাত-ফাঁকিবাজ বাঙালী জাতিকে আরও অলস ও অকর্মণ্য করে তোলে। কলকারখানা, অফিস, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃঙ্খলা উচ্ছন্নে যায়। সিটু, এস এফ আই, গ ঘ ফে, এ বি টি-এ, কুটা, ওয়েবকুটা, কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বারো-ই জুলাই কমিটি মিলে শিল্প, শিক্ষা ও সরকারি, বেসরকারি দপ্তরে নরক গুলজার করে তোলে। ভদ্রলোকের ছেলেরা অফিসের কাজ শিকেয় তুলে অফিস গেটে বসে গণসঙ্গীতগাইতে থাকে, কেউ কেউ বেগুনি, ফুলুরি, চপ তৈরি ও বিক্রয় করতে লেগে যায়। কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তেলে ভাজা বিপ্লব!

আর সে ফাঁকে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের আসন সংখ্যা দুই থেকে বেড়ে ২৩০-এ দাঁড়ায়। তাদের ভুঁড়ি এত বেড়ে যায় যে নীচের দিকে তাকিয়ে নিজের পা কোথায় আছে, কোথায় পড়ে তা দেখারও অবস্থা নেই। তার ফলে খানাখন্দে পড়ে এখন নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। চোরাবালিতে আটকে পড়ে এক পা তুলতে গিয়ে আরেক পা তলিয়ে যাবার দশা।

"আর সে ফাঁকে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের আসন সংখ্যা দুই থেকে বেড়ে ২৩০-এ দাঁড়ায়। তাদের ভুঁড়ি এত বেড়ে যায় যে নীচের দিকে তাকিয়ে নিজের পা কোথায় আছে, কোথায় পড়ে তা দেখারও অবস্থা নেই। তার ফলে খানাখন্দে পড়ে এখন নাকানি-চোবানি খাচ্ছে।"

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

মহাকালিকা শিবশক্তি

(১১ পাতার পর)

অন্যরূপে শক্তি। সৃষ্টি মূলে কাম জীব জগতে কখনও পুরুষের আবেশ, আবার কখনও প্রকৃতনিষ্ঠ উন্মাদনা। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন শক্তির প্রাধান্য, জীব-জগতের অবস্থা প্রায় একরকম মহা প্রকৃতিরই প্রাধান্য।

দেবীভাগবত অনুযায়ী সকাম সাধকগণ সগুণভাবে আর বাসনা পরিবর্জিত জ্ঞান বৈরাগ্যপূর্ণ নির্মলচেতা যোগীগণ নির্গুণভাব আশ্রয় করে সাধনা করেন।

পরিশেষে শ্রীশ্রী মহামায়া দুর্গা মহাকালীর চরণে দাসানুদাসের সভক্তি কোটি প্রণাম নিবেদন করে। যুগসূর্য শ্যামাপ্রসাদ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শক্তি সাধনা ও নেতাজীর 'শারদা তিলক' পাঠ ও প্রাণতোষিণী তন্ত্র পাঠের উল্লেখ করছি।

আমাদের লক্ষ্য অখণ্ড ভারত-মহাভারত সৃজন আর পুনর্গঠন — সেই লক্ষ্যে মহাদেবী আদ্যশক্তি মহাকালিকা শ্রীশ্রী দুর্গাকে আমাদের অনন্ত কোটি প্রার্থনা ও প্রণাম নিবেদন করছি।

সূত্র :

(১) দেবী ভাগবত — মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব — আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত নবভাবত প্রকাশন।

(২) সারদা তিলক

(৩) তন্ত্রালোক — অভিনব গুপ্ত

(৪) বেদ — হরফ প্রকাশন

ইত্যাদি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও আর্ন্তপ্রেরণা ঃ

(১) শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কার নাথ দেব

(২) শ্রীমদ্ সদানন্দ চক্রবর্তী (কিংকর ভূমানন্দদেব)

Swastika
12 October - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

▲ বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সুসজ্জিত মূল রথ। কুরুক্ষেত্র থেকে এই রথের যাত্রা শুরু হল।
◀ গো-গ্রাম যাত্রার সূচনায় গো-মাতাকে আরতি করছেন রাঘবেশ্বর ভারতী।

গো-গ্রাম যাত্রাপথের আনন্দগান

- সমগ্র যাত্রাটি সারা ভারতবর্ষের লক্ষাধিক গ্রাম ছুঁয়ে যাবে।
- ১০৮দিনে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করবে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা।
- হাজারেরও বেশি উপ-যাত্রা সংঘটিত হবে গ্রাম থেকে এবং সেগুলি মহকুমা, জেলা এবং রাজ্যস্তরে মূল যাত্রার সঙ্গে মিশে যাবে।
- গো-নিধন বন্ধে এবং গোরুকে জাতীয় পশু রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবীসনদের জন্য দশ কোটিরও বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করার পরিকল্পনা রয়েছে যাত্রাপথে।
- আগামী বছরের ১৭ই জানুয়ারি নাগপুরে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সমাপ্তি হবে।

১৯ অক্টোবর '০৯ প্রকাশিত হবে

স্বস্তিকা

দীপাবলী সংখ্যার আকর্ষণ

'গোরু বাঁচলেই গ্রাম বাঁচবে – এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিজয়া দশমী থেকে সারা ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়েছে 'বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা'। এই যাত্রার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, প্রারম্ভিক তথ্য এবং অর্থনৈতিক বিকাশে গো-সম্পদের ভূমিকা, গোরু নিয়ে দলাদলি, পশ্চিমবঙ্গের গোশালা প্রভৃতি একগুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে –

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা

–ঃ লিখেছেন ঃ–

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, শিবাশিস দণ্ড, নবকুমার ভট্টাচার্য, গোপাল চক্রবর্তী, অসিতবরণ আইচ, স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ।

এছাড়াও থাকছে –

আর এস এস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের বিজয়া দশমীর ভাষণ এবং রাঘবেশ্বর ভারতী স্বামীজীর সাক্ষাৎকার।

রঙিন প্রচ্ছদ।। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।। দাম ঃ ছয় টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম ব্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com